৩- সূরা আলে-ইমরান

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

সূরার আয়াত সংখ্যাঃ ২০০ আয়াত।

সূরার নাযিল হওয়ার স্থানঃ সূরাটি সর্বসম্মতভাবে মাদানী সূরা।

সূরার নামকরণঃ এ সূরার ৩৩ ও ৩৪ নং আয়াতদ্বয়ে আলে-ইমরানের কথা বলা হয়েছে। একেই আলামত হিসেবে এর নাম গণ্য করা হয়েছে। এ সূরার আরেক নাম আয্-যাহ্‌রাহ্ বা আলোকচ্ছটা। [মুসলিমঃ ৮০৪] এছাড়াও এ সূরাকে সূরা তাইবাহ্, আল-কান্য, আল-আমান, আল-মুজাদালাহ্, আল-ইস্তেগফার, আল-মা'নিয়্যাহ্ ইত্যাদি নাম দেয়া হয়েছে।

সূরার ফযীলতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ, তা পাঠকারীর জন্য কেয়ামতের দিন সুপারিশকারী হিসেবে আসবে। তোমরা দু'টি আলোকচ্ছটাময় সূরা আল-বাকারাহ্ ও সূরা আলে-ইমরান পড়; কেননা, এ দু'টি সূরা কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যেন দু'টি মেঘখণ্ড অথবা দু'টি ছায়া অথবা দু'ঝাঁক পাখির মত। তারা এসে এ দু'সূরা পাঠকারীদের পক্ষ নেবে।' [মুসলিমঃ ৮০৪] অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'কেয়ামতের দিন কুরআন আসবে যারা কুরআনের উপর আমল করেছে, তাদের পক্ষ হয়ে। তখন সূরা আল-বাকারাহ্ ও সূরা আলে-ইমরান থাকবে সবার অগ্রে।' [মুসলিমঃ ৮০৫]

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ①

اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ②

১. আলিফ্-লাম-মীম(১),

২. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ্ নেই(২), তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার

(১) এগুলোকে হুরূফে মুকাত্তা'আত বলে। যার আলোচনা সূরা বাকারার প্রথমে চলে গেছে।

(২) এ আয়াতে তাওহীদের ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যেমন, মনে করুন, কোন একটি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী ও বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একমত। পূর্বাপর এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শত শত, এমন কি হাজার হাজার বছরের ব্যবধান। একজনের উক্তি অন্য জনের কাছে পৌঁছারও কোন উপায় নেই। তা সত্ত্বেও যিনিই আসেন তিনিই যদি পূর্ববর্তীদের মত একই কথা বলেন, একই কর্ম ও একই বিশ্বাসের অনুসারী হন, তবে এমন বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করে নিতে মানব-স্বভাব বাধ্য। উদাহরনতঃ আল্লাহ্ তা'আলার

তাওহীদের পরিচয় সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ সর্বপ্রথম আদম আলাইহিস্ সালাম দুনিয়াতে পদার্পণ করেন। তার ওফাতের পর তার বংশধরদের মধ্যে আল্লাহ্র একত্ববাদ সম্পর্কিত এই তথ্যের চর্চা প্রচলিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আদম সন্তানদের প্রাথমিক কালের আচার-অভ্যাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন সূচীত হওয়ার পর নূহ 'আলাইহিস্ সালাম আগমন করেন। তিনিও মানুষকে আল্লাহ্র একত্ববাদ সম্পর্কিত ঐসব বিষয়ের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন, যেসব বিষয়ের দিকে আদম 'আলাইহিস্ সালাম দাওয়াত দিতেন। অতঃপর সুদীর্ঘকাল অতীতের গর্ভে বিলীন হওয়ার পর ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস্ সালাম ইরাক ও সিরিয়ায় জন্মগ্রহন করেন। তাঁরাও হুবহু একই দাওয়াত নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতরন করেন। এরপর মুসা ও হারুন 'আলাইহিমাস্ সালাম এবং তাদের বংশের রাসূলগণ আগমন করেন। তারা সবাই সে একই কালেমায়ে তাওহীদের বাণী প্রচার করেন এবং এ কালেমার প্রতি মানুষজনকে দাওয়াত দিতে থাকেন। এরপরও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সেই একই আহ্বান নিয়ে আগমন করেন। সবার শেষে খাতামুল-আম্বিয়া মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়াতে আবির্ভূত হন।

মোটকথা, আদম থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী ও রাসূল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সবাই একই বাণী উচ্চারণ করেন। তাদের অধিকাংশেরই পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয়নি। তাদের আবির্ভাবকালে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার আমলও ছিল না যে, এক রাসূল অন্য রাসূলের গ্রন্থাদি ও রচনাবলী পাঠ করে তার দাওয়াতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবেন; বরং তাদের একজন অন্যজন থেকে বহুদিন পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। জাগতিক উপকরণাদির মাধ্যমে পূর্ববর্তী রাসূলগণের কোন অবস্থা তাদের জানা থাকারও কথা নয়। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী লাভ করেই তারা পূর্বসুরীদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই তাদেরকে এ দাওয়াত প্রচার করার জন্য নিযুক্ত করা হয়। এখন যে ব্যক্তি ইসলাম ও তাওহীদের দাওয়াতের প্রতি মনে মনে কোনরূপ বৈরীভাব পোষণ করে না, সে যদি খোলা মনে সরলভাবে চিন্তা করে, তবে এত বিপুল সংখ্যক নবী-রাসূল বিভিন্ন সময় এক বিষয়ে একমত হওয়াই বিষয়টির সত্যতা নিরূপণের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু রাসূলগণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, তাদের সততা ও সাধুতার উচ্চতম মাপকাঠির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কারো পক্ষে এরূপ বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, তাদের বাণী ষোল আনাই সত্য এবং তাদের দাওয়াতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেরই মঙ্গল নিহিত। [তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন]

ধারক[১]।

৩. তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, পূর্বে যা এসেছে[২] তার সত্যতা প্রতিপন্নকারীরূপে। আর তিনি নাযিল করেছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জীল।

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۙ

৪. ইতোপূর্বে মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ[৩]; আর তিনি ফুরকান নাযিল করেছেন[৪]। নিশ্চয় যারা

مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'দু'টি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার ইসমে আ'যম রয়েছে, এক, ﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾ দুই, সূরা আলে ইমরানের প্রথম দু' আয়াত'। [তিরমিযীঃ ৩৪৭৮]

(২) কাতাদা বলেন এখানে পূর্বে যা এসেছে তা বলা দ্বারা কুরআনের পূর্বে যে সমস্ত কিতাবাদি নাযিল হয়েছে সেগুলোকে বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে মুজাহিদ বলেন, এখানে পূর্বে যা এসেছে বলে, পূর্বেকার যাবতীয় কিতাব ও রাসূলকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এই কুরআন পূর্বতন সকল নবী-রাসূল ও যাবতীয় কিতাবের সত্যয়নকারী। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৩) কাতাদা বলেন, এ দু'টি আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাব। এতে রয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বর্ণনা। যে এ দু'টি থেকে হিদায়াত গ্রহণ করেছে, সত্য বলে বিশ্বাস করেছে এবং সেটা অনুসারে আমল করেছে সে নিরাপত্তা পেয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] সে হিসেবে এটাকে মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিল করা হয়েছে বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ারপর এ দু'টি গ্রন্থ রহিত হয়ে গেছে, তা থেকে হিদায়াত লাভের আর কোন উপায় নেই।

(৪) ওয়াসিলা ইবন আসকা' রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহীফাসমূহ রামাদান মাসের প্রথম রাত্রিতে নাযিল হয়েছিল, তাওরাত নাযিল হয়েছিল রামাদান মাসের ছয়দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, ইঞ্জীল নাযিল হয়েছিল রামাদান মাসের তের রাত্রি পার হওয়ার পর। আর ফুরকান নাযিল হয়েছিল রামাদান মাসের চব্বিশ রাত্রি পার হওয়ার পর।" [মুসনাদে আহমাদ ৪/১০৭] কাতাদাহ বলেন, আয়াতে ফুরকান বলে পবিত্র কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তা নাযিল করে এর মাধ্যমে হক ও বাতিলের পার্থক্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর হালালকৃত বস্তুকে হালাল এবং হারামকৃত বস্তুকে এর মাধ্যমে হারাম ঘোষণা করেছেন। তাঁর শরী'আতকে প্রবর্তন করেছেন। অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে

আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহে কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর আল্লাহ্ মহা-পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী(১)।

وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝٤

৫. নিশ্চয় আল্লাহ্, আসমান ও যমীনের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না(২)।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝٥

৬. তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন(৩)। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই; (তিনি) প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٦

দিয়েছেন। কি কি জিনিস ফরয করেছেন তা বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অবাধ্যতা হতে নিষেধ করেছেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি এবং সর্ববিষয়ে সার্বিক সামর্থ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে জননীর উদরে তিনটি অন্ধকার স্তরের মাঝে কিরূপ নিপুণভাবে গঠন করেছেন। তাদের আকার-আকৃতি ও বর্ণ বিন্যাসে এমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আকৃতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে একজনের আকার-আকৃতি অন্যজনের অনুরূপ নয় বিধায়, স্বতন্ত্র পরিচয় দুরূহ হয়ে পড়ে। এহেন সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের যুক্তিসঙ্গত দাবী এই যে, ইবাদাত একমাত্র তাঁরই করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কারো জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য এরূপ নয়। কাজেই অন্য কেউ ইবাদাতের যোগ্যও নয়। [মা'আরিফুল কুরআন]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু জানেন। সূরা আল-আন'আমে এ বিষয়টি বিস্তারিত এসেছে, সেখানে আরও বলা হয়েছে যে, এসব কিছু তিনি যে শুধু জানেন তা-ই নয় বরং তিনি তা এক গ্রন্থে লিখেও রেখেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "আর অদৃশ্যের চাবি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত, তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।" [সূরা আল-আন'আম: ৫৯]

(৩) কাতাদা বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, আমাদের রব তাঁর বান্দাদেরকে মায়ের গর্ভে যেভাবে ইচ্ছা গঠন করতে পারেন। ছেলে বা মেয়ে, কালো বা গৌরবর্ণ, পূর্ণসৃষ্টি অথবা অপূর্ণসৃষ্টি। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۭ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاۗءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاۗءَ تَاْوِيْلِهٖ ۘ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ

৭. তিনিই আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন যার কিছু আয়াত 'মুহ্কাম', এগুলো কিতাবের মূল; আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহ্'(১), সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে শুধু তারাই ফেৎনা এবং ভুল ব্যাখ্যার

(১) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট আয়াতের কথা উল্লেখ করে একটি সাধারণ মুলনীতি ও নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যার দ্বারা অনেক আপত্তি ও বাদানুবাদের অবসান ঘটে। এর ব্যাখ্যা এরূপ, কুরআনুল কারীমে দুই প্রকার আয়াত রয়েছে। এক প্রকারকে 'মুহ্কামাত' তথা সুস্পষ্ট আয়াত এবং অপর প্রকারকে 'মুতাশাবিহাত' তথা অস্পষ্ট আয়াত বলা হয়।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মুহকাম হচ্ছে, ঐ সব আয়াতগুলো, যা নাসেখ বা রহিতকারী, যাতে আছে হালাল-হারামের বর্ণনা, শরী'আতের সীমারেখা, ফরয-ওয়াজিব, ঈমান ও আমলের বিষয়াদির বর্ণনা। পক্ষান্তরে মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ হচ্ছে, যা মানসূখ বা রহিত, যাতে উদাহরণ ও এ জাতীয় বিষয়াদি পেশ করা হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

প্রথম প্রকার আয়াতকে আল্লাহ্ তা'আলা 'উম্মুল কিতাব' আখ্যা দিয়েছেন। এর অর্থ এই যে, এসব আয়াতই সমগ্র শিক্ষার মূল ভিত্তি। এসব আয়াতের অর্থ যাবতীয় অস্পষ্টতা ও জটিলতামুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার আয়াতে বক্তার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এগুলো সম্পর্কে বিশুদ্ধ পন্থা হল, এসব আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের আলোকে দেখা। যে আয়াতের অর্থ প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে যায়, তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বক্তার এমন উদ্দেশ্য বুঝতে হবে, যা প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে নয়। উদাহরণতঃ ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে কুরআনের সুস্পষ্ট উক্তি এরূপ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ অর্থাৎ "সে আমার নেয়ামত প্রাপ্ত বান্দা ছাড়া অন্য কেউ নয়।" [সূরা আয্-যুখরুফঃ ৫৯] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্র কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে আদমের অনুরূপ আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে।" [সূরা আলে-ইমরানঃ ৫৯] এসব আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াত থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত এবং তাঁর সৃষ্ট। অতএব 'তিনি উপাস্য, তিনি আল্লাহ্র পুত্র'- নাসারাদের এসব দাবী সম্পূর্ণ বানোয়াট। তারা যদি كَلِمَةُ اللهِ 'আল্লাহ্র কালেমা' বা رُوْحٌ مِنْهُ 'তাঁর পক্ষ থেকে রূহ' শব্দদ্বয় দ্বারা দলীল নেয়ার চেষ্টা করে তখন তাদের বলতে হবে যে, পূর্বে বর্ণিত আয়াতসমূহের আলোকেই এশব্দদ্বয়কে বুঝতে হবে। সে আলোকে উপরোক্ত كَلِمَةُ اللهِ ও رُوْحٌ مِنْهُ শব্দদ্বয় সম্পর্কে এটাই বলতে হয় যে, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্র নির্দেশে সৃষ্ট হয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে পাঠানো একটি রূহ মাত্র।

يَقُولُونَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে(১)। অথচ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর(২) তারা বলে, 'আমরা

(১) বলা হয়েছে, 'যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে'। ইবনে আব্বাস বলেন, যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে এ কথা বলে যাদের অন্তরে সন্দেহ রয়েছে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। তারা মুহকাম আয়াতকে মুতাশাবিহ আয়াতের উপর এবং মুতাশাবিহ আয়াতকে মুহকাম আয়াতের উপর ইচ্ছাকৃত সন্দেহ লাগানোর জন্য নির্ধারণ করে, ফলে তারা নিজেরা সন্দেহে পতিত হয় এবং পথভ্রষ্ট হয়। তারা সঠিক পথ গ্রহণ করতে সচেষ্ট থাকে না। [আত-তাফসীরুস সহীহ] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল লোককে কুরআনের আয়াত সম্পর্কে পরস্পর বাদানুবাদে লিপ্ত দেখে বললেন, "তোমাদের পূর্বের লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারা আল্লাহ্র কিতাবের একাংশকে অপর অংশের বিপরীতে ব্যবহার করত। আল্লাহর কুরআন তো এ জন্যই নাযিল হয়েছিল যে, এর একাংশ অপর অংশের সত্যয়ণ করবে। সুতরাং তোমরা এর একাংশকে অপর অংশের কারণে মিথ্যারোপ করো না। এর যে অংশের অর্থ তোমরা জানবে সেটা বলবে, আর যে অংশের অর্থ জানবে না সেটা আলেম বা যারা জানে তাদের কাছে সোপর্দ করো।" [মুসনাদে আহমাদ ২/১৮৫, নং ৬৭৪১; মুসান্নাফে ইবন আবী শাইবাহ ১১/২১৬-২১৭, হাদীস নং ২৩৭০]

(২) এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গভীর জ্ঞানের অধিকারীগণ কি এ সমস্ত মুতাশাবিহাতের অর্থ জানে কি না? কোন কোন মুফাসসির এখানে تأويل শব্দের অর্থভেদে এর উত্তর দিয়েছেন। কারণ, تأويل শব্দটির এক অর্থ, তাফসীর বা ব্যাখ্যা। অপর অর্থ, সেই প্রকৃত উদ্দেশ্য, যার জন্য আয়াতটি নিয়ে আসা হয়েছে। যদি প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে এর কোন কোন অর্থ মুফাসসিরগণ করেছেন। যা ব্যাখ্যার পর্যায়ে পড়ে। সে হিসেবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছিলেন, 'আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা এগুলোর تأويلতথা ব্যাখ্যা জানে।' [তাবারী] আর যদি দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তখন এর অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। অধিকাংশ সাহাবী, তাবে'য়ী এই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করে বলেছেন যে, মুতাশাবিহাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। যেমন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমদের জ্ঞানের দৃঢ়তার পরিচয় এই যে, তারা মুহকাম ও মুতাশাবিহ সব ধরনের আয়াতের উপরই ঈমান এনেছে, অথচ তারা মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের تأويل তথা প্রকৃত ব্যাখ্যা জানে না।' অনুরূপভাবে উবাই ইবন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ এগুলোর تأويل তথা প্রকৃত ব্যাখ্যা জানে না, বরং তারা বলে, 'আমরা এগুলোতে ঈমান আনি, সবই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে'। [তাবারী]

এগুলোতে ঈমান রাখি, সবই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে'[১]; এবং জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

৮. 'হে আমাদের রব! সরল পথ দেয়ার পর আপনি আমাদের অন্তরসমূহকে সত্য লঙ্ঘনপ্রবণ করবেন না। আর আপনার কাছ থেকে আমাদেরকে করুণা দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা।'

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾

৯. 'হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি সমস্ত মানুষকে একদিন একত্রে সমবেত করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই[২]; নিশ্চয় আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাফ করেন না।'

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, যারা সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন তারা অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে বেশী তথ্যানুসন্ধান ও ঘাটাঘাটি করে না; বরং তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস করে যে, এ আয়াতটিও আল্লাহ্র সত্য কালাম। তবে তিনি কোন বিশেষ হেকমতের কারণে এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেননি। প্রকৃতপক্ষে এ পন্থাই বিপদমুক্ত ও সতর্কতাযুক্ত। এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক এমনও আছে, যাদের অন্তর বক্র। তারা সুস্পষ্ট আয়াত থেকে চক্ষু বন্ধ করে অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে ঘাটাঘাটিতে লিপ্ত থাকে এবং তা থেকে নিজ মতলবের অনুকূলে অর্থ বের করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। এরূপ লোকদের সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতখানি তিলাওয়াত করে বললেন, "যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে যারা এ সমস্ত (মুতাশাবিহ) আয়াতের পিছনে দৌড়াচ্ছে, তখন বুঝে নিবে যে, আল্লাহ্ এ সমস্ত লোকের কথাই পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তখন তাদের থেকে সাবধান থাকবে।" [বুখারী: ৪৫৪৭; মুসলিম: ২৬৬৫]

(২) শাফা'আতের বিখ্যাত হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বাপর সকল মানুষকে কিয়ামতের দিন এক মাঠে একত্রিত করবেন। অতঃপর তাদের অবস্থা এমন হবে যে, তাদের চক্ষু পরস্পরকে বেষ্টন করবে এবং তারা যে কোন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনতে পাবে। আর সূর্য তাদের নিকটবর্তী করা হবে।" [বুখারী: ৩৩৬১]

দ্বিতীয় রুকূ'

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾

১০. নিশ্চয় যারা কুফরী করে আল্লাহ্‌র নিকট তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না এবং এরাই আগুনের ইন্ধন(১)।

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾

১১. তাদের অভ্যাস ফির'আউনী সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায়, তারা আমার আয়াতগুলোতে মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন(২)। আর আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

(১) মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে কাফেরদের সম্পর্কে এটা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। "যেদিন যালেমদের কোন ওজর-আপত্তি কাজে আসবে না, আর তাদের জন্য থাকবে লা'নত এবং তাদের জন্য থাকবে খারাপ আবাস" [গাফের: ৫২] দুনিয়াতে তাদেরকে যে সমস্ত সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হয়েছিল তাও তাদের কোন উপকার দিবে না এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র কঠোর শাস্তি ও কঠিন পাকড়াও থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হবে না। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন, "কাজেই ওদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আপনাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো এসবের দ্বারাই ওদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। ওরা কাফের থাকা অবস্থায় ওদের আত্মা দেহত্যাগ করবে" [আত-তাওবাহ: ৫৫] আরও বলেন, "যারা কুফরী করেছে, দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই আপনাকে বিভ্রান্ত না করে। এ তো স্বল্পকালীন ভোগ মাত্র; তারপর জাহান্নাম তাদের আবাস; আর ওটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!"[সূরা আলে ইমরান: ১৯৬-১৯৭]

(২) আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে ফির'আউনের পূর্বেকার যে সমস্ত সম্প্রদায়কে তাদের অপরাধের কারণে পাকড়াও করা হয়েছিল তাদের পরিচয় ও অপরাধের বিবরণ দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র তাদেরকে নূহ, হূদ, সালেহ, লূত ও শু'আইবের সম্প্রদায় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সে সমস্ত স্থানে তাদের অপরাধ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করেছিল এবং রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করেছিল। যেমন, সামূদ সম্প্রদায় কর্তৃক উষ্ট্রী হত্যা, লূত সম্প্রদায়ের সমকামিতা, শু'আইব এর সম্প্রদায় কর্তৃক মাপ ও ওজনে কম দেয়া ইত্যাদি। [আদওয়াউল বায়ান]

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

১২. যারা কুফরী করে তাদেরকে বলুন, 'তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে। আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল!'

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿١٣﴾

১৩. দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। একদল যুদ্ধ করছিল আল্লাহ্‌র পথে, অন্য দল ছিল কাফের; তারা তাদেরকে চোখের দেখায় দেখছিল তাদের দ্বিগুণ। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা আপন সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন(১)। নিশ্চয়ই এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে(২)।

(১) আলোচ্য আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধে কাফেরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তাদের কাছে সাতশ' উট ও একশ' অশ্ব ছিল। অপরপক্ষে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিনশ'র কিছু বেশী। তাদের কাছে সর্বমোট সত্তরটি উট, দু'টি অশ্ব, ছ'টি লৌহবর্ম এবং আটটি তরবারী ছিল। মজার ব্যাপার ছিল এই যে, প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতেই প্রতিপক্ষ দলের সংখ্যা নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ প্রতিভাত হচ্ছিল। এর ফলে মুসলিমদের আধিক্য কল্পনা করে কাফেরদের অন্তর উপর্যুপরি শঙ্কিত হচ্ছিল এবং মুসলিমগণও নিজেদের অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করছিলেন। তারা পূর্ণ ভরসা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র ওয়াদা- "যদি তোমাদের মধ্যে একশ' ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দুইশ'র বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে।" [সূরা আল-আনফালঃ ৬৬] -এর ওপর আস্থা রেখে আল্লাহ্‌র সাহায্যের আশা করছিলেন। কাফেরদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল তিনগুণ। তা যদি মুসলিমদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে যেত, তবে তাদের মনে ভয়-ভীতি সঞ্চার হওয়াটা ছিল সাধারণ। আবার কোন কোন অবস্থায় উভয় দলই প্রতিপক্ষকে কম দেখেছিল। [সীরাতে ইবন হিশাম]

(২) বদর যুদ্ধের কয়েকটি বিষয় ছিল অত্যন্ত শিক্ষণীয়ঃ এক) মুসলিম ও কাফেররা যেভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল, তাতে উভয় দলের নৈতিক ও চারিত্রিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাদের একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছিল, অপরদল

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾

১৪. নারী, সন্তান, সোনারূপার স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য বস্তু(১)। আর আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।

তাগুত, শির্ক ও শয়তানের পথে যুদ্ধ করছিল। আল্লাহ্ তাঁর পথে যুদ্ধকারীদের অন্যদের উপর বিজয় দিয়েছিলেন। এ থেকে ইয়াহূদীরা শিক্ষা নেয়া উচিত ছিল। [আইসারুত তাফাসীর] দুই) মুসলিমরা সংখ্যায় নগণ্য ও অস্ত্রে অপ্রতুল হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে কাফেরদের বিশাল সংখ্যা ও উন্নত অস্ত্র-সস্ত্রের মোকাবেলা করেছে, তাতে এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাহায্যপুষ্ট। [সা'দী] তিন) আল্লাহর প্রবল প্রতাপ ও অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে গাফেল হয়ে যারা সংখ্যাধিক্য ও সমরাস্ত্রের শক্তিতে আত্মম্ভরিতায় মেতে উঠেছিল, আল্লাহ্ তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন। [মানার]

(১) আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মনে এসব বস্তুর প্রতি স্বভাবগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে যে, কে এগুলোর আকর্ষণে মত্ত হয়ে আখেরাতকে ভুলে যায় এবং কে এসবের আসল স্বরূপ ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয় অবগত হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয় ও আখেরাতের কল্যাণ আহরণের লক্ষ্যে তার সুচারু ব্যবহার করে। আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বস্তুকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছেন, শরীয়ত অনুযায়ী সেগুলো পরিমিত উপার্জন করলে এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সঞ্চয় করলে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী হাসিল হবে। পক্ষান্তরে অবৈধ পন্থায় সেগুলো ব্যবহার করলে অথবা বৈধ পন্থায় হলেও এগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত নিমজ্জিত হয়ে আখেরাত বিস্মৃত হয়ে গেলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। [সা'দী] অর্থাৎ এসব হচ্ছে পার্থিব জীবনে ব্যবহার করার জন্য; মন বসাবার জন্য নয়। আর আল্লাহ্র কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা। সেখানে চিরকাল থাকতে হবে এবং যার নেয়ামত ধ্বংস হবে না, হ্রাসও পাবে না। আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনের জন্য যে নেয়ামত রেখেছেন, তার তুলনা দুনিয়ার জীবনের সামগ্রীসমূহের কোন কিছু দিয়েই দেয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে তা অভিশপ্ত। তবে যা আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণে করা হয় ও তার সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং দ্বীনী জ্ঞানে আলেম ও দ্বীনী জ্ঞান অর্জনকারী। [তিরমিযী: ২৩২২; ইবন মাজাহ: ৪১১২]

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

১৫. বলুন, 'আমি কি তোমাদেরকে এসব বস্তু থেকে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দেব? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে সন্তুষ্টি(১)। আর আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

১৬. যারা বলে, হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি; কাজেই আপনি আমাদের গোনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।'

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

১৭. তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থী(২)।

---

(১) আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তখন তারা বলবে, আমরা হাজির, তখন তিনি বলবেন: তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না অথচ আপনি আমাদেরকে এমন কিছু দান করেছেন যা আর কোন সৃষ্টিকে দান করেননি। তখন তিনি বলবেন: আমি তোমাদেরকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু দান করব। তারা বলবে, হে রব! এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে? তিনি বলবেন: আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অবতরণ করাব, এর পর আমি আর কখনও তোমাদের উপর ক্রোধান্বিত হব না।" [বুখারী: ৬৫৪৯, মুসলিম: ২৮২৯]

(২) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাদের রব আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাত্রে যখন রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন প্রথম আসমানে নেমে এসে বলতে থাকেন, কে আমাকে ডাকবে যে আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আমার কাছে চাইবে যে আমি তাকে দিব? কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে যে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব? [বুখারী: ১১৪৫; মুসলিম: ৭৫৮] এর দ্বারা শেষ রাত্রির ইবাদতের গুরুত্ব বোঝা যায়। এ সময়কার দো'আ কবুল হয়। এটা মূলত: তাহাজ্জুদের সময়।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۸﴾

১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন(১) যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই। আর ফেরেশ্তাগণ এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ্ ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, (তিনি) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹﴾

১৯. নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দ্বীন(২)। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা কেবলমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর কেউ আল্লাহ্র আয়াতসমূহে কুফরী করে,

(১) অর্থাৎ যে আল্লাহ্ বিশ্ব জাহানের সমস্ত তত্ত্ব, সত্য ও রহস্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞান রাখেন, যিনি সমগ্র সৃষ্টিকে আবরণহীন অবস্থায় দেখছেন এবং যার দৃষ্টি থেকে পৃথিবী ও আকাশের কোন একটি বস্তুও গোপন নেই এটি তার সাক্ষ্য। আর তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য আর কে দিতে পারে? কারণ পৃথিবীতে ইলাহের স্বত্ব দাবী করার অধিকার ও যোগ্যতা কারও নেই। তিনি নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন হক্ক ইলাহ নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করা যুলুম ও অন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলার এ সাক্ষ্যের সাথে তিনি আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাদেরকেও শরীক করেছেন। তারাও এ মহৎ সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আলেম তথা দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানীদেরকেও এ সাক্ষ্য প্রদানের জন্য গ্রহণ করে সম্মানিত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি মূলত: আলেম তথা দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানীদের সম্মান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। [ইবনুল কাইয়্যেম: মিফতাহু দারিস সা'আদাহ; তাফসীরে সা'দী]

(২) সুদ্দী বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম'। এটা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা এবং জ্ঞানীদের সাক্ষ্যের বিষয়। অর্থাৎ তারা এ সাক্ষ্যও দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। [তাবারী] কাতাদা বলেন, ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত হক্ক কোন মা'বুদ নেই এ সাক্ষ্য দেয়া, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার স্বীকৃতি প্রদান। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত দ্বীন যা তিনি প্রবর্তন করেছেন, রাসূলদেরকে যা নিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর বন্ধুদেরকে যার দিশা দিয়েছেন। এটা ব্যতীত তিনি আর কিছু গ্রহণ করবেন না। এটা অনুপাতে না হলে তিনি কাউকে পুরস্কৃত করবেন না। [তাবারী]

তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

২০. সুতরাং যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে আপনি বলুন, 'আমি আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসারিগণও।' আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বলুন, 'তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ?' যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তারা হেদায়াত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। আর আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা(১)।

তৃতীয় রুকূ'

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ

২১. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহে কুফরী করে, অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা

(১) আয়াতে বর্ণিত أَسْلَمْتُمْ শব্দটির মূল অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে 'আত্মসমর্পণ করা' অনুবাদ করা হয়েছে। এর আরেক অনুবাদ এভাবেও করা যায় যে, যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে আপনি বলুন, 'আমি ইসলামকে কবুল করেছি এবং আমার অনুসারিগণও।' এর মাধ্যমে অপরাপর ধর্মের অনুসারীরা মুসলিমদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে যাবে যে, তাদেরকে আবার বিভ্রান্ত করার সুযোগ নেই। [সা'দী] আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে ও নিরক্ষর অর্থাৎ মক্কার কুরাইশ ও তাদের অনুসারীদেরকে বলুন, 'তোমরাও কি ইসলামকে গ্রহণ করে নিয়েছ?' যদি তারা তোমরা যেভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছ সেভাবে ইসলামকে কবুল করে তবে নিশ্চয় তারা হেদায়াত পাবে এবং তারা তোমাদের ভাই-বন্ধুতে পরিণত হবে। আর যদি তারা ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাদের পূর্ববর্তী ধর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তবে আপনার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। প্রচারের সওয়াব আপনি অবশ্যই পাবেন। তাদের উপরও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দলীল প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যাতে করে তাদের শাস্তি প্রদান করা সম্ভব হয়। [সা'দী]

ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, আপনি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন।

يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾

২২. এসব লোক, এদের কার্যাবলী দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়েছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

২৩. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের অংশ প্রদান করা হয়েছিল? তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; তারপর তাদের একদল ফিরে যায় বিমুখ হয়ে(১)।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. এটা এজন্যে যে তারা বলে থাকে, 'মাত্র কয়েকদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে কখনই স্পর্শ করবে না।' আর তাদের নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে তাদের মিথ্যা উদ্ভাবন তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে(২)।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾

---

(১) কাতাদা বলেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্‌র দুশমন ইয়াহূদীরা। তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা হয়, তাদেরকে আল্লাহ্‌র নবীর প্রতিও আহ্বান জানানো হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে বিভিন্ন মতপার্থক্যজনিত বিষয়ে তিনি ফয়সালা করে দেন। যে নবীর বর্ণনা তারা তাদের কিতাবে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে। তারপরও তারা সে কিতাব ও নবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। [তাবারী]

(২) কাতাদা বলেন, তারা মনে করে থাকে যে, যে সময়টুকুতে তারা অর্থাৎ পূর্বপুরুষরা গো-বৎসের পুজা করেছিল, সে সময়টুকুতেই শুধু তাদের শাস্তি হবে। তারপর তাদের আর শাস্তি হবে না। এই যে বিশ্বাস তা কোন শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাদের ভিত্তি হচ্ছে দ্বীনের উপর মিথ্যা দাবী করা। কারণ তারা দাবী করে বলে থাকে যে, 'আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান-সন্ততি ও প্রিয় মানুষ' [সূরা আল-মায়িদাহ:১৮] এটা অবশ্যই তাদের মিথ্যা উদ্ভাবন। [তাবারী]

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۖ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. সুতরাং (সেদিন) কি অবস্থা হবে? যেদিন আমি তাদেরকে একত্র করব যাতে কোন সন্দেহ নেই এবং প্রত্যেককে তাদের অর্জিত কাজের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

قُلِ اللَّهُمَّ مَٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

২৬. বলুন, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা আপনি হীন করেন। কল্যাণ আপনারই হাতে(১)। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

تُولِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

২৭. 'আপনি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করান; আপনি মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান। আর আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্ক দান করেন।'

(১) আয়াতে আল্লাহ্কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছেঃ "আপনার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ"। আয়াতের প্রথমাংশে রাজত্ব দান করা ও ছিনিয়ে নেয়া এবং সম্মান ও অপমান উভয়দিক উল্লেখ করা হয়েছিল। এতে রয়েছে কল্যাণ ও অকল্যাণ। কিন্তু আয়াতে শুধু আল্লাহ্র হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ একথা বলা হয়েছে। অকল্যাণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয় এধরণের শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। তার কারণ হল, সহীহ্ আকীদা অনুসারে আল্লাহ্র প্রতি অকল্যাণের সম্পর্ক দেখানো জায়েয নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেছেনঃ 'অকল্যাণ আপনার পক্ষ থেকে নয়।' [মুসলিমঃ ৭৭১] কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার জন্য অকল্যাণ চান না। মানুষের যাবতীয় অকল্যাণ মানুষের হাতের কামাই করা।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾

২৮. মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ছাড়া কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। আর যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর(১)। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন(২) এবং আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ

২৯. বলুন, 'তোমাদের অন্তরে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন কর বা ব্যক্ত কর,

(১) কোন কাফেরের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। এ আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, মুসলিমদের কোন ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতার চুক্তি করার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, যে কেউ সেটা করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র দ্বীনে তার কোন অংশ থাকবে না। কেননা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ঈমানের সাথে একত্রিতভাবে থাকতে পারে না। ঈমান তো শুধু আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র বন্ধু মুমিনদের সাথে সম্পর্ক রাখতে বলে যারা আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে জিহাদ করে। আল্লাহ্ বলেন, "আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীরা তারা পরস্পর পরস্পরের ওলী" [সূরা আত-তাওবাহ: ৭১] সুতরাং কেউ যদি ঈমানদারদের ব্যতীত এমন কাফেরদেরকে বন্ধু বানায় যারা আল্লাহ্‌র নূরকে নিভিয়ে দিতে চায় এবং তাঁর বন্ধুদেরকে বিপদে ফেলতে চায়, তাহলে সে মুমিনদের গণ্ডি থেকে বের হয়ে কাফেরদের গণ্ডিভুক্ত হবে। এজন্যই আল্লাহ্ বলেছেন, কেউ যদি তাদেরকে বন্ধু বানায় তবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, কাফেরদের থেকে দুরে থাকতে হবে, তাদেরকে বন্ধু বানানো যাবে না, তাদের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক থাকতে পারবে না। অনুরূপভাবে তাদের প্রতি অনুরাগী হওয়া যাবে না। কোন কাফেরকে মুসলিমদের উপর কর্তৃত্ব দেয়া যাবে না। [সা'দী]

(২) আল্লাহ্‌র ভয়ের পরিবর্তে মানুষের ভয় যেন তোমাদেরকে আচ্ছন্ন করে না রাখে; কেননা মানুষের ভয় ও ক্ষতির সম্ভাবনা দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি ও ক্ষতির সম্ভাবনা দুনিয়া ছাড়িয়ে আখেরাতেও ব্যাপৃত। সুতরাং আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে ভীত থাক। যে কাজে তার শাস্তি অবধারিত সে কাজ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। যদি তোমরা তাঁর অবাধ্য হও তবে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। [সা'দী]

يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

আল্লাহ্ তা অবগত আছেন(১)। আর আসমানসমূহে যা আছে এবং যমীনে যা আছে তাও তিনি জানেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

৩০. যেদিন প্রত্যেকে সে যা ভাল আমল করেছে এবং সে যা মন্দ কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে, সেদিন সে কামনা করবে- যদি তার এবং এর মধ্যে বিশাল ব্যবধান থাকত(২)! আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন। আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল।

চতুর্থ রুকূ'

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ

৩১. বলুন, 'তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর(৩), আল্লাহ্

(১) আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু সম্যকরূপে জানেন। মানুষের অন্তরে কি আছে, এমনকি কি উদিত হবে তাও আল্লাহ্ জানেন। কারণ, হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যখন প্রথম কলম সৃষ্টি করলেন, তখন তাকে বললেন, লিখ। তখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা সবই লিখা হতে লাগল।" [মুসনাদে আহমাদ ৫/৩১৭] সুতরাং মানুষের মনে কি উদিত হবে সেটাও কলম লিখে রেখেছে।

(২) অর্থাৎ তার মধ্যে এবং তার আমলের মধ্যে বিশাল ব্যবধান কামনা করবে। তারা চাইবে যেন তাদের আমলনামা তাদেরকে দেয়া না হয়।

(৩) ভালবাসা একটি গোপন বিষয়। কারো প্রতি কারো ভালবাসা আছে কি না, অল্প আছে কি বেশী আছে, তা জানার একমাত্র মাপকাঠি হল, অবস্থা ও পারস্পরিক ব্যবহার দেখে অনুমান করা অথবা ভালবাসার চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখে জেনে নেয়া। যারা আল্লাহ্‌কে ভালবাসার দাবীদার এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্খী, আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ভালবাসার মাপকাঠি তাদের বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ জগতে যদি কেউ আল্লাহ্‌র ভালবাসার দাবী করে, তবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণের কষ্টিপাথরে তা যাচাই করে দেখা অত্যাবশ্যকীয়। এতে আসল ও মেকী ধরা পড়বে। যার দাবী যতটুকু সত্য হবে, সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে ততটুকু যত্নবান হবে

لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

৩২. বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর।' তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না(১)।

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ

৩৩. নিশ্চয় আল্লাহ্ আদম, নূহ্ ও ইব্‌রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের(২)

এবং তার শিক্ষার আলোকে পথের মশালরূপে গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে যার দাবী দুর্বল হবে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে তার দুর্বলতা সেই পরিমানে পরিলক্ষিত হবে। ভালবাসা অনুসারে মানুষের হাশরও হবে। হাদীসে এসেছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিয়ামত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এর জন্য কি তৈরী করেছ? লোকটি বলল, আমি এর জন্য তেমন সালাত, সাওম ও সাদকা করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালবাস"। [বুখারী: ৬১৭১]

(১) আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, "নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না"। এ থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা ফরয। আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও রাসূলের আনুগত্যের মধ্যে তারতম্য করা যাবে না। আল্লাহ্‌র নির্দেশ যেমন মানতে হবে, তেমনি রাসূলের নির্দেশও মানতে হবে। কেউ আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল কিন্তু রাসূলের আনুগত্য করল না, সে কুফরীর গণ্ডি থেকে বের হতে পারল না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি যেন কাউকে এ রকম না দেখতে পাই যে, সে সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছে, তখন তার কাছে আমি যে সমস্ত আদেশ-নিষেধ দিয়েছি সে সমস্ত আদেশ-নিষেধের কোন কিছু এসে পড়ল, তখন সে বলল: আমরা জানি না, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে যা পেয়েছি তার অনুসরণ করেছি"। [আবু দাউদ ৪৬০৫; তিরমিযী: ২৬৬৩; ইবনে মাজাহ: ১৩] সুতরাং কোন ঈমানদারের পক্ষে রাসূলের আদেশ-নিষেধ পাওয়ার পর সেটা কুরআনে নেই বলে বাহানা করার কোন সুযোগ নেই। যদি তা করা হয় তবে তা হবে সুস্পষ্ট কুফরী।

(২) এখানে ইমরান বলতে মার্‌ইয়াম 'আলাইহাস্ সালামের পিতাকে বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মূসা আলাইহিস সালাম এর পিতার নামও ইমরান ছিল। [মুসলিম: ১৬৫]

وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۙ

বংশধরকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর মনোনীত করেছেন(১)।

ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ

৩৪. তারা একে অপরের বংশধর। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৩৫. স্মরণ করুন, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার রব! আমার গর্ভে যা আছে নিশ্চয় আমি তা একান্ত আপনার জন্য মানত করলাম(২)। কাজেই আপনি আমার নিকট থেকে তা কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰى ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْۤ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ

৩৬. তারপর যখন সে তা প্রসব করল তখন সে বলল, 'হে আমার রব! নিশ্চয় আমি তা প্রসব করেছি কন্যারূপে।' সে যা প্রসব করেছে তা সম্পর্কে আল্লাহ্

তা এখানে উদ্দেশ্য নয়। পরবর্তী আয়াত থেকেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে ইবরাহীম, ইমরান, ইয়াসীন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের মধ্যে যারা ঈমানদার কেবল তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদেরকেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী ও রহমত বহনের জন্য মনোনীত করেছেন। এদের বংশধরদের মধ্যে যারা কাফের বা মুশরিক তাদের বোঝানো হয়নি। [তাবারী]

(২) কাতাদা বলেন, ইমরানের স্ত্রী তার গর্ভে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে দিয়ে দেয়ার মনস্থ করেছিলেন। তারা সাধারণত: পুরুষ সন্তানদেরকে উপাসনালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। যদি কাউকে উপসনালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হত, সে কখনো উপাসনালয় ত্যাগ করত না। তার কাজই হতো উপাসনালয়ের দেখাশোনা করা। কোন মহিলাকে এ কাজের জন্য দেয়া হতো না। কারণ, মহিলাকে এ কাজের উপযুক্ত বিবেচনা করা হতো না। কারণ, তার সৃষ্টিগত কিছু সমস্যা রয়েছে, যেমন, হায়েয ও নিফাস। যা উপাসনালয়ে অবস্থানের জন্য উপযুক্ত ছিল না। এ জন্যই ইমরান স্ত্রী যখন সন্তান প্রসব করে দেখলেন যে, তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন, তখন কি করবেন স্থির করতে না পেরে বলেছিলেন, 'রব! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি'। পরবর্তীতে মানত অনুসারে সে কন্যা সন্তানকেই উপাসনালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। [তাবারী]

الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝

সম্যক অবগত। আর পুত্রসন্তান কন্যা সন্তানের মত নয়। আর আমি তার নাম মার্‌ইয়াম রেখেছি(১) এবং অভিশপ্ত শয়তান হতে তার ও তার সন্তানকে আপনার আশ্রয়ে দিচ্ছি(২)।'

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ؕ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ

৩৭. তারপর তার রব তাকে ভালভাবে কবুল করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন(৩) এবং তিনি তাকে যাকারিয়্যার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন(৪)। যখনই যাকারিয়্যা

(১) এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জন্মের দিনই নাম রাখা জায়েয। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'গত রাতে আমার এক সন্তান জন্ম হয়েছে, আমি তার নাম আমার পিতার নামানুসারে ইব্‌রাহীম রাখলাম।' [মুসলিমঃ ২৩১৫] অন্য এক হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল, গত রাতে আমার সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, আমি তার কি নাম রাখব? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তার নাম রাখ আব্দুর রহমান।' [বুখারীঃ ৬১৮৬, মুসলিমঃ ২১৩৩]

(২) এ দো'আর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা মার্‌ইয়াম ও ঈসা 'আলাইহিমাস্ সালামকে শয়তান থেকে হেফাযত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'সন্তান জন্মগ্রহণের সাথে সাথে শয়তান তাকে স্পর্শ করে, ফলে সে চিৎকার করে। কেবলমাত্র মার্‌ইয়াম ও তার সন্তান এর ব্যতিক্রম।' [বুখারীঃ ৩৪৩১, ৪৫৪৮, মুসলিমঃ ২৩৬৬]

(৩) এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তিনি তাকে দেহসৌষ্ঠবে মনোমুগ্ধকর বানিয়েছিলেন, ফলে যে কেউ তাকে দেখত তার ভক্ত হয়ে যেত। কাতাদা বলেন, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, মারইয়াম ও ঈসা দুনিয়ার অন্যান্য আদম সন্তানের মত গোনাহের কাজে জড়াত না। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(৪) কিভাবে মারইয়াম আলাইহাস সালাম যাকারিয়্যা আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে আসলেন এখানে বর্ণনা করা হয় নি। পরবর্তী ৪৪ নং আয়াত থেকে সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। যাদেরকে উপাসনালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হতো তারা সাধারণত উপাসনালয়েই থাকত। তাদের আর কোন অভিভাবকের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু যেহেতু মারইয়াম আলাইহাস সালাম কন্যা সন্তান ছিলেন, সেহেতু তৎকালীন সবাই চিন্তা করলেন যে, তার তত্ত্বাবধান করার মত লোকের প্রয়োজন। সবাই তার তত্ত্বাবধান চাচ্ছিল। এমতাবস্থায় তাদের কলম দিয়ে তারা লটারী করেছিল। সে লটারীতে যাকারিয়্যা আলাইহিস সালামের নাম উঠে এসেছিল।

بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

তার কক্ষে প্রবেশ করত তখনই তার নিকট খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেত। তিনি বলতেন, 'হে মার্‌ইয়াম! এ সব তুমি কোথায় পেলে?' (মার্‌ইয়াম) বলতেন, 'তা আল্লাহ্‌র নিকট হতে।' নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত রিয্‌ক দান করেন।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

৩৮. সেখানেই যাকারিয়্যা তার রবের নিকট প্রার্থনা করে বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে আপনি আপনার নিকট থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী(১)।'

(১) যাকারিয়্যা 'আলাইহিস্ সালাম তখনো পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। সময়ও ছিল বার্ধক্যের- যে বয়সে স্বাভাবিকভাবে সন্তান হয় না। তবে আল্লাহ্‌র শক্তি-সামর্থের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, অলৌকিকভাবে এহেন বার্ধক্যের মধ্যেও তিনি সন্তান দিতে পারেন। তবে অসময়ে ও অস্থানে দান করার আল্লাহ্‌র মহিমা ইতিপূর্বে তিনি কখনো প্রত্যক্ষ করেননি। কিন্তু এসময় যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফলের মওসুম ছাড়াই মার্‌ইয়ামকে ফল দান করেছেন, তখনই তার মনের সুপ্ত আকাঙ্খা জেগে উঠল এবং তার মনে হলো যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মওসুম ছাড়াই যদি ফল দিতে পারেন, তবে বৃদ্ধ দম্পতিকে হয়ত সন্তানও দেবেন। বললেনঃ 'হে আমার রব! আমাকে আপনি আপনার নিকট থেকে সৎ সন্তান দান করুন', এতে বুঝা যায় যে, সন্তান হওয়ার জন্য দো'আ করা রাসূলগণের ও নেককারদের সুন্নাত। অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ 'আপনার আগে তো আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাঁদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম' অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেরূপ স্ত্রী ও সন্তান দান করা হয়েছে, তদ্রূপ এই নেয়ামত পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও দেয়া হয়েছিল। এখন কেউ যদি কোন পন্থায় সন্তান জন্মগ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তবে সে শুধু স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে না; বরং রাসূলদের একটি সার্বজনীন ও সর্বসম্মত সুন্নাহ্ থেকেও বঞ্চিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ ও সন্তানের প্রশ্নটিকে অত্যাধিক গুরুত্ব দান করেছেন। তাই যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বিবাহ কিংবা সন্তান গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে, তাকে তিনি স্বীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুমতি দেননি। তিনি বলেনঃ 'বিবাহ আমার সুন্নাহ্। যে ব্যক্তি এ সুন্নাহ্ থেকে বিমুখ হয়, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ কর। কেননা, তোমাদের আধিক্যের কারণে আমি অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করব'। [ইবনে মাজাহ্ঃ ১৮৪৬]

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ أَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৩৯. অতঃপর যখন যাকারিয়্যা ইবাদত কক্ষে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন তখন ফেরেশ্‌তারা তাকে আহ্বান করে বলল, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনাকে ইয়াহ্‌ইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগমনকৃত এক কালেমাকে সত্যায়নকারী(১), নেতা(২), ভোগ আসক্তিমুক্ত(৩) এবং পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত একজন নবী।'

قَالَ رَبِّ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ

৪০. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমার পুত্র হবে কিভাবে? অথচ আমার

(১) এখানে কালেমা বলতে 'ঈসা আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ঈসা আলাইহিস সালামকে 'কালেমাতুল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র বাণী বলা হয়েছে, কারণ, তিনি শুধু আল্লাহ্‌র কালেমা বা নির্দেশে চিরাচরিত প্রথার বিপরীতে পিতার মাধ্যম ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখানে তাকে 'আল্লাহ্‌র কালাম' বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করে সম্মানিত করাই উদ্দেশ্য। নতুবা সবকিছুই আল্লাহ্‌র কালেমার মাধ্যমেই হয়। তাঁর কালেমা ব্যতীত কিছুই হয় না।

(২) কাতাদা বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ তিনি ইবাদাত, সহিষ্ণুতা, জ্ঞান ও পরহেযগারীতে সবার শীর্ষ নেতা হিসেবে ছিলেন। পক্ষান্তরে মুজাহিদ বলেন, সাইয়্যেদ অর্থ হচ্ছে, তিনি আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানিত ছিলেন। [তাবারী]

(৩) এটা ইয়াহ্‌ইয়া আলাইহিস্ সালামের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এর অর্থ, যিনি যাবতীয় কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। উদাহরণতঃ উত্তম পানাহার, উত্তম পোষাক পরিধান এবং বিবাহ ইত্যাদি। এ গুণটি প্রশংসার ক্ষেত্রে উল্লেখ করায় বাহ্যতঃ মনে হয় যে, এটাই উত্তম পন্থা। অথচ বিভিন্ন হাদীসে বিবাহিত জীবন-যাপন করাই যে উত্তম একথা প্রমাণিত আছে। এ সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কারো অবস্থা ইয়াহ্‌ইয়া 'আলাইহিস্ সালামের মত হয়- অর্থাৎ অন্তরে আখেরাতের চিন্তা প্রবল হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রয়োজন অনুভূত না হয় এবং স্ত্রী ও সন্তানদের হক আদায় করার মত অবকাশ না থাকে, তবে তার পক্ষে বিবাহ না করাই উত্তম। এ কারণেই যে সব হাদীসে বিবাহের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তাতে এ কথাও বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ রাখে এবং স্ত্রীর হক আদায় করতে পারে, তার পক্ষেই বিবাহ করা উত্তম।' [বুখারীঃ ১৮০৬, মুসলিমঃ ১৪০০] এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এর ব্যতিক্রম হলে বিবাহ ওয়াজিব নয়।

وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾

বার্ধক্য এসে গিয়েছে[১] এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা।' তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'এভাবেই।' আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন[২]।

قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤١﴾

৪১. তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে একটি নিদর্শন দিন[৩]।' তিনি বললেন, 'আপনার নিদর্শন এই যে, তিন দিন আপনি ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলবেন না[৪] আর আপনার রবকে অধিক স্মরণ

---

(১) এ আয়াতে বার্ধক্যের পরিমাণ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। পক্ষান্তরে সূরা মারইয়ামে বার্ধক্যের পরিমাণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, 'আমি বার্ধক্যে এমনভাবে উপনীত হয়েছি যে আমার জোড়া ও হাড়ের মজ্জাও শুকিয়ে গেছে'। [সূরা মারইয়াম: ৮]

(২) যাকারিয়্যা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। সন্তানের জন্য নিজে দো'আও করেছিলেন। দো'আ কবুল হওয়ার বিষয়ও তিনি অবগত ছিলেন। এতসবের পরেও 'কিভাবে আমার পুত্র হবে' বলার অর্থ, খুশী হওয়া এবং আশ্চার্যান্বিত হওয়া। [মুয়াসসার, সা'দী] তিনি পুত্র হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী বর্তমানে বার্ধক্যের যে পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি, তা বহাল রেখেই পুত্র দান করা হবে, না এতে কোনরূপ পরিবর্তন করা হবে? [বাগভী] আল্লাহ্ তা'আলা উত্তরে বলেছিলেন যে, না তোমরা বার্ধক্যাবস্থায়ই থাকবে এবং এ অবস্থাতেই তোমাদের সন্তান হবে। [কাশশাফ]

(৩) প্রতিশ্রুত সেই সুসংবাদটি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতি এবং পুত্র জন্মগ্রহণের পূর্বেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মশগুল হওয়ার উদ্দেশ্যে যাকারিয়্যা 'আলাইহিস্ সালাম নিদর্শন জানতে চেয়েছিলেন। [কাশশাফ; ফাতহুল কাদীর] আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ নিদর্শন দিলেন যে, তিন দিন পর্যন্ত তুমি মানুষের সাথে ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলতে সমর্থ হবে না। এ নিদর্শনের মধ্যে সূক্ষ্মতা এই যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিদর্শন চাওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এমন নিদর্শন দিলেন যে, তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম অন্য কোন কাজের যোগ্যই থাকবেন না। [ফাতহুল কাদীর]

(৪) এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কথা বলতে অক্ষম হলে ইশারা-ইঙ্গিত কথার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দাসীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আল্লাহ্ কোথায়? উত্তরে সে আকাশের দিকে ইশারা করলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ দাসী মুসলিম। তাকে আযাদ করে দাও।' [মুসলিমঃ ৫৩৭]

করুন এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন।'

পঞ্চম রুকূ'

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ الْعَٰلَمِينَ ﴿٤٢﴾

৪২. আর স্মরণ করুন, যখন ফেরেশ্‌তাগণ বলেছিল, 'হে মার্‌ইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনাকে মনোনীত করেছেন এবং পবিত্র করেছেন আর বিশ্বজগতের নারীগণের উপর আপনাকে মনোনীত করেছেন(১)।'

يَٰمَرْيَمُ اقْنُتِى لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِى مَعَ الرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

৪৩. 'হে মার্‌ইয়াম! আপনার রবের অনুগত হন এবং সিজ্‌দা করুন আর রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করুন।'

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۖ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. এটা গায়েবের সংবাদের অন্তর্ভুক্ত, যা আমরা আপনাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি। আর মার্‌ইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এর জন্য যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল(২) আপনি তখন

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'সবচেয়ে উত্তম মহিলা হলেন মার্‌ইয়াম বিনতে ইমরান। অনুরূপভাবে সবচেয়ে উত্তম মহিলা হলেন খাদীজা বিনতে খুয়াইলেদ।' [বুখারীঃ ৩৪৩২, মুসলিমঃ ২৪৩০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'পুরুষের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা লাভ করেছে। মেয়েদের মধ্যে কেবলমাত্র ফির'আউনের স্ত্রী আছিয়া এবং ইমরানের কন্যা মার্‌ইয়াম পূর্ণতা লাভ করেছে আর সমস্ত নারীদের উপর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব যেমন সমস্ত খাবারের উপর 'ছারীদ'-এর শ্রেষ্ঠত্ব।' [বুখারী: ৩৪৩৩; মুসলিম: ২৪৩১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সৃষ্টিকুলের মহিলাদের মধ্যে শুধু উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মারইয়াম বিনতে ইমরান, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ ও ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া।" [তিরমিযী: ৩৮৭৮; মুসনাদে আহমাদ ৩/১৩৫; মুসান্নাফে আবদির রায্‌যাক: ১১/৪৩০]

(২) অর্থাৎ তারা কলম ফেলে লটারী করে মারইয়াম আলাইহাস সালাম কার তত্ত্বাবধানে

তাদের নিকট ছিলেন না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনো আপনি তাদের নিকট ছিলেন না।

إِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾

৪৫. স্মরণ করুন, যখন ফেরেশ্‌তাগণ বললেন, 'হে মার্‌ইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ আপনাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন(১)। তার নাম মসীহ্‌, মার্‌ইয়াম তনয় 'ঈসা, তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের

থাকবেন সেটা নির্ধারণ করছিলেন। ইসলামী শরীয়তে লটারী সম্পর্কিত বিধান এই যে, যেসব হকের কারণ শরীয়তানুযায়ী নির্দিষ্ট ও জানা আছে, সেসব হকের মীমাংসা লটারীযোগে করা নাজায়েয এবং তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণতঃ শরীকানাধীন বস্তুর মীমাংসা লটারীযোগে করা এবং লটারীতে যার নাম বের হয় তাকে সম্পূর্ণ বস্তুটি দিয়ে দেয়া অথবা কোন শিশুর পিতৃত্বে মতবিরোধ দেখা দিলে লটারীযোগে একজনকে পিতা মনে করে নেয়া। পক্ষান্তরে যেসব হকের কারণ জনগণের রায়ের ওপর ন্যস্ত, সেসব হকের মীমাংসা লটারীযোগে করা জায়েয। যথা- কোন্‌ শরীককে কোন্‌ অংশ দেয়া হবে, সেটা লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা করা। এক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে একজনকে পূর্বের অংশ অন্যজনকে পশ্চিমের অংশ দেয়া জায়েয। এর কারণ এই যে, লটারী ছাড়াই উভয়পক্ষ একমত হয়ে যদি এভাবে অংশ নিত অথবা বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে এভাবে নিত, তবুও তা জায়েয হত। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে সব শরীকের অংশ সমান হয়, সেখানে কোন এক দিককে এক শরীকের জন্যে নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে লটারী জায়েয। [দেখুন, কুরতুবী]

(১) কালেমা দ্বারা এখানে কি বুঝানো হয়েছে? কাতাদা বলেন, কালেমা দ্বারা كُنْ বা 'হও' শব্দ বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] ঈসা আলাইহিস সালামকে 'কালেমাতুল্লাহ' বলার কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি আল্লাহ্‌র কালেমা দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন। কেননা, ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ব্যাপারটি জাগতিক কোন মাধ্যম বাদেই সংঘটিত হয়েছে। আর আল্লাহ্‌ তাকে তাঁর নিদর্শন ও আশ্চর্যতম সৃষ্টি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে মারইয়ামের নিকট পাঠালেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম তার জামার ফাঁকে ফু দিলেন। এ পবিত্র ফেরেশতার পবিত্র ফুঁ মারইয়ামের গর্ভে প্রবেশ করলে আল্লাহ্‌ তা'আলা সে ফুঁকটিকে পবিত্র রুহ হিসেবে পরিণত করলেন। আর এ জন্যই তাঁকে সম্মানিত করে 'রুহুল্লাহ' বলা হয়ে থাকে। [তাফসীরে সা'দী]

অন্যতম হবেন(১)।

৪৬. আর তিনি দোলনায়(২) ও বয়োঃপ্রাপ্ত অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলবেন(৩)

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

(১) অর্থাৎ দুনিয়াতে তার সম্মান হবে অনেক বড়। কারণ, আল্লাহ্ তাকে দৃঢ়সংকল্প রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বড় শরী'আত ও তার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। তার স্মরণকে এমনভাবে সারা দুনিয়াব্যাপী করেছেন যে, প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্য তার সুনামে ভরপূর করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আখেরাতেও তার মর্যাদা হবে অনেক বেশী। অন্যান্য নবী-রাসূলদের সাথে তিনিও আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবেন। তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে যারা তার সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়েছে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে তার মুখ থেকে সত্য বের করে বিশেষভাবে সম্মানিত করবেন। [তাফসীরে সা'দী]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'দোলনায় মাত্র তিন জন কথা বলেছেন। ঈসা, জুরাইজের সময়ের এক ছোট বাচ্ছা আর একটি বাচ্ছা।' [বুখারীঃ ২৪৮২, অনুরূপ ৩৪৩৬; মুসলিমঃ ২৫৫০] দোলনায় তিনি কি কথা কাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন তা এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, তিনি তার কাওমের লোকদেরকে তার নিজের পরিচয় দিয়ে তার মাকে বিব্রত অবস্থা থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি তো আল্লাহ্র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন, 'যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে। 'আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত, হতভাগ্য; 'আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হব।' [সূরা মারইয়াম: ৩০-৩৩]

(৩) আয়াতে বলা হয়েছে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম শৈশব ও পৌঢ় বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবেন। নিঃসন্দেহে শৈশবে পূর্ণ বয়স্কদের মত জ্ঞানীসুলভ, মেধাসম্পন্ন প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাবে কথা বলা একটি মু'জিযা। কিন্তু তার সাথে 'পৌঢ় বয়সে কথা বলা'র ব্যাপারটির কি সম্পর্ক থাকতে পারে? অধিকাংশ আলেমদের নিকট এর উত্তর এই যে, মূলত: শৈশব অবস্থায় কথা বলার মু'জিযা বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। তার সাথে পৌঢ় বয়সেও কথা বলবেন বলা দ্বারা উভয় অবস্থায়ই তার কথা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জ্ঞানীসুলভ হবে এমনটি বোঝানো হয়েছে। কোন কোন আলেম বলেন, তিনি যেহেতু যুবক বয়সে পৌঢ় হবার পূর্বেই আসমানে উত্থিত হয়েছেন, সেহেতু এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি পৌঢ় অবস্থায় আবার ফিরে এসে মানুষের সাথে কথা বলবেন। সুতরাং আবার ফিরে আসার ব্যাপারটি এ আয়াতের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয়ে গেল। যা আরেকটি অলৌকিক ব্যাপার।

এবং তিনি হবেন পূণ্যবানদের একজন।'

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

৪৭. সে বলল, 'হে আমার রব! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি, এমতাবস্থায় আমার সন্তান হবে কিভাবে?' তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'এভাবেই', আল্লাহ্ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়(১)।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আর তিনি তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল।'

(১) এ আয়াতে মারইয়াম আলাইহাস সালাম কর্তৃক ঈসা আলাইহিস সালামকে গর্ভে ধারনের বিষয়টির ইঙ্গিত রয়েছে। এর বিস্তারিত বর্ণনা সূরা মারইয়ামে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, "বর্ণনা করুন এ কিতাবে মার্ইয়ামের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল, তারপর তাদের থেকে সে পর্দা করল। এরপর আমরা তার কাছে আমাদের রূহকে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মার্ইয়াম বলল, আমি তোমার থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি (আল্লাহ্কে ভয় কর) যদি তুমি 'মুত্তাকী হও', সে বলল, 'আমি তো তোমার রব-এর দূত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য। মার্ইয়াম বলল, 'কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?' সে বলল, 'এ রূপই হবে।' তোমার রব বলেছেন, 'এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমরা তাকে এজন্যে সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমাদের কাছ থেকে এক অনুগ্রহ; এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।' তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল; [১৬-২২] এখানেও গর্ভে ধারনের প্রক্রিয়াটি কিভাবে সম্পন্ন হয়েছে সেটা বলা হয়নি। সূরা আল-আম্বিয়ায় বলা হয়েছে যে, "অতঃপর আমরা তার (মারইয়ামের) মধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম" [৯১]। আর যিনি রূহ ফুঁকে দেয়ার কাজটি করেছিলেন, তিনি ছিলেন জিবরীল আলাইহিস সালাম। কারণ, সূরা আলে ইমরান ও সূরা মারইয়ামের আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মারইয়ামের কাছে যিনি এসেছিলেন, তিনি স্বয়ং জিবরাইল আলাইহিস সালাম। এ সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করলে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মকাহিনী স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

৪৯. আর তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূলরূপে' (প্রেরণ করবেন, তিনি বলবেন) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দ্বারা একটি পাখিসদৃশ আকৃতি গঠন করব; তারপর তাতে আমি ফুঁ দেব; ফলে আল্লাহ্‌র হুকুমে সেটা পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহ্‌র হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থকে নিরাময় করব এবং মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা তোমাদের ঘরে যা খাও এবং মজুদ কর তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা মুমিন হও।'

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

৫০. 'আর আমার সামনে তাওরাতের যা রয়েছে তার সত্যায়নকারীরূপে এবং তোমাদের জন্য যা হারাম ছিল তার কিছু হালাল করে দিতে। এবং আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

৫১. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার রব এবং তোমাদেরও রব, কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর। এটাই সরল পথ(১)।'

(১) এখানেও 'সিরাতে মুস্তাকীম' বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। যেমন পূর্বে সূরা আল-ফাতিহার তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝۵۲

৫২. যখন 'ঈসা তাদের থেকে কুফরী উপলব্ধি করলেন তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র পথে কারা আমার সাহায্যকারী(১)?' হাওয়ারীগণ(২) বলল, 'আমরাই আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম।

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝۵۳

৫৩. 'হে আমাদের রব! আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এ রাসূলের অনুসরণ করেছি। কাজেই আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।'

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۭ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۝۵۴

৫৪. আর তারা কুটকৌশল করেছিল আল্লাহ্‌ও কৌশল করেছিলেন; আর

(১) এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। মুজাহিদ বলেনঃ এর অর্থ হল কে আমার অনুসরণ করবে আল্লাহ্‌র পথে? সুফিয়ান সাওরী বলেনঃ এর অর্থ কে আল্লাহ্‌র সাথে আমাকে সহযোগিতা করবে? মুজাহিদের কথা এখানে সবচেয়ে বেশী প্রণিধানযোগ্য। তবে সবচেয়ে স্পষ্ট মত হল, এর অর্থ কে আমাকে সাহায্য করবে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানের ক্ষেত্রে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের মৌসুমে ডেকে ডেকে বলতেনঃ 'এমন কে আছে যে আমাকে আশ্রয় দেবে, যাতে করে আমি আমার প্রভূর বাণী প্রচার করতে পারি। কেননা, কুরাইশরা আমাকে আমার রবের বাণী প্রচারে বাধা দিচ্ছে।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৩৩৯-৩৪০]

(২) ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের খাঁটি ভক্তদের উপাধি ছিল হাওয়ারী- তাদের আন্তরিকতা ও মনের স্বচ্ছতার কারণে অথবা যেহেতু তারা সাদা পোষাক পরিধান করতেন এ জন্য তাদেরকে হাওয়ারী নামে অভিহিত করা হত। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের উপাধি ছিল সাহাবী। কোন কোন তাফসীরবিদ হাওয়ারীদের সংখ্যা দ্বাদশ উল্লেখ করেছেন। 'হাওয়ারী' শব্দটি কোন সময় শুধু সাহায্যকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ 'প্রত্যেক রাসূলের একজন হাওয়ারী অর্থাৎ খাঁটি সহচর থাকে আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়ের' [বুখারীঃ ২৬৯১, মুসলিমঃ ২৪১৫]

আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী(১)।

ষষ্ঠ রুকূ'

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ

৫৫. স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ বললেন, 'হে 'ঈসা! নিশ্চয় আমি আপনাকে পরিগ্রহণ করব(২), আমার নিকট আপনাকে

(১) আরবী ভাষায় 'মাকর' শব্দের অর্থ সুরক্ষা ও গোপন কৌশল। উত্তম লক্ষ্য অর্জনের জন্য মকর ভাল এবং মন্দ লক্ষ্য অর্জনের জন্য হলে তা মন্দও হতে পারে। এ আয়াতে কাফেরদের 'মাকার'-এর বিপরীতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকেও 'মাকার' করার কথা এ কারণেই যোগ করা সঠিক হয়েছে। বাংলা ভাষার বাচনভঙ্গিতে 'মাকার' শব্দটি শুধু ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এ নিয়ে আরবী বাচনভঙ্গিতে সন্দেহ করা উচিত নয়। আরবী অর্থের দিক দিয়েই এখানে আল্লাহ্কে 'শ্রেষ্ঠতম কুশলী' বলা হয়েছে। তাছাড়া مَكْر ও خِدَاع এবং এ জাতীয় শব্দসমূহের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো, এগুলো যদি কাফেরদের مَكْر ও خِدَاع এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয় তখন সেটি খারাপ গুণ হিসেবে বিবেচিত হয় না। বরং কাফেরদের مَكْر ও خِدَاع এর বিপরীতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে مَكْر ও خِدَاع করা একটি ইতিবাচক গুণ। [সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, আস-সাক্কাফ] উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াহূদীরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও গোপন কৌশল অবলম্বন করতে আরম্ভ করে। তারা অনবরত বাদশাহ্র কাছে বলতে থাকে যে, লোকটি আল্লাদ্রোহী। সে তাওরাত পরিবর্তন করে সবাইকে বিধর্মী করতে সচেষ্ট। এসব অভিযোগ শুনে বাদশাহ্ তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন। ইয়াহূদীদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার সূক্ষ্ম ও গোপন কৌশলও স্বীয় পথে অগ্রসর হচ্ছিল। পরবর্তী আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে।

(২) مُتَوَفِّيكَ শব্দের ধাতু توفي এবং মূলধাতু وفي অভিধানে এর অর্থ পুরোপুরি লওয়া। আরবী ভাষার সব অভিধান গ্রন্থেই এ অর্থ রয়েছে। মৃত্যুর সময় মানুষ নির্ধারিত আয়ূপূর্ণ করে ফেলে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত আত্মা পুরোপুরি নিয়ে নেয়া হয়। এ কারণে শব্দটি মৃত্যু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মানুষের দৈনন্দিন নিদ্রা মৃত্যুর একটি হাল্কা নমুনা। কুরআনে এ অর্থেও توفي শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ অর্থাৎ"আল্লাহ্ মৃত্যুর সময় প্রাণ নিয়ে নেন। আর যাদের মৃত্যু আসে না, তাদের প্রাণও নিদ্রার সময় নিয়ে নেন।" [সূরা আয্-যুমারঃ ৪২] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ مُتَوَفِّيكَ এর অর্থ, 'আমি আপনাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেব এবং শেষ যামানায় স্বাভাবিক মৃত্যুদান করব। এ তাফসীরের সারমর্ম এই যে, مُتَوَفِّيكَ শব্দের অর্থ মৃত্যু; কিন্তু আয়াতের শব্দে رَافِعُكَ إِلَيَّ প্রথমে ও مُتَوَفِّيكَ পরে হবে। এখানে مُتَوَفِّيكَ কে পূর্বে উল্লেখ করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, নিজের কাছে

اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

উঠিয়ে নিব(১) এবং যারা কুফরী করে তাদের মধ্য থেকে আপনাকে পবিত্র করব। আর আপনার অনুসারিগণকে কেয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের উপর প্রাধান্য দিব, তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।' অতঃপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটেছে আমি তোমাদের মধ্যে তার মীমাংসা করে দেব(২)।

উঠিয়ে নেয়া চিরতরে নয়; বরং এ ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্য হবে। এরপর তিনি আবার দুনিয়াতে আসবেন, শত্রুদের পরাজিত করবেন এবং অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। এভাবে আকাশ থেকে পুনর্বার অবতরণ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের পর মৃত্যুবরণের ঘটনাটি একাধারে একটি মু'জিযা। এতদসঙ্গে ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের সম্মান ও মর্যাদার পূর্ণত্বলাভ এবং নাসারাদের এ বিশ্বাসের খণ্ডন যে, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম অন্যতম উপাস্য। নতুবা জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়ার ঘটনা থেকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আরও জোরদার হয়ে যেত যে, তিনিও আল্লাহ্ তা'আলার মতই চিরঞ্জীব এবং ভালমন্দের নিয়ামক। এ কারণে প্রথমে مُتَوَفِّيكَ বলে এসব ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এরপর নিজের দিকে উঠিয়ে নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) এতে বাহ্যতঃ ঈসা 'আলাইহিস্ সালামকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনাকে উপরে উঠিয়ে নেব। সবাই জানেন যে, ঈসা শুধু আত্মার নাম নয়; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের নাম। কাজেই আয়াতে দৈহিক উত্তোলন বাদ দিয়ে শুধু আত্মিক উত্তোলন বুঝা সম্পূর্ন ভুল। কুরআনের অন্যত্রও ইয়াহূদীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ﴿بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ অর্থাৎ ইয়াহূদীরা নিশ্চিতই ঈসাকে হত্যা করেনি, বরং "আল্লাহ্ তাকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।" [সূরা আন্-নিসাঃ ১৫৮] "নিজের কাছে তুলে নেয়া" সশরীরে তুলে নেয়াকেই বলা হয়।

(২) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের বিপক্ষে ঈসা আলাইহিস্ সালামের সাথে পাঁচটি অঙ্গীকার করেছেনঃ

সর্বপ্রথম অঙ্গীকার এই যে, তার মৃত্যু ইয়াহূদীদের হাতে হত্যার মাধ্যমে হবে না; বরং প্রতিশ্রুত সময়ে স্বাভাবিক পন্থায় হবে। প্রতিশ্রুত সময়টি কেয়ামতের নিকটতম যামানায় আসবে। তখন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। বিভিন্ন সহীহ্ ও মুতাওয়াতির হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্গীকার ছিল যে, ঈসা 'আলাইহিস্ সালামকে আপাততঃ ঊর্ধ্ব জগতে তুলে নেয়া হবে। সাথে সাথে এ অঙ্গীকার পূর্ণ করা হয়। তৃতীয় অঙ্গীকার ছিল

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তারপর যারা কুফরী করেছে আমি তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই(১) ।

শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত করা । এ অঙ্গীকার এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করে ইয়াহূদীদের যাবতীয় অপবাদ দূর করে দেন । উদাহরণতঃ পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করার কারণে ইয়াহূদীরা ঈসা আলাইহিস্ সালামের জন্ম বিষয়ে অপবাদ আরোপ করত । কুরআন এ অভিযোগ খণ্ডন করে বলেছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র কুদরত ও নির্দেশে পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন । এটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয় । আদমের জন্মগ্রহণ ছিল আরো বেশী বিস্ময়কর ব্যাপার । কারণ, তিনি পিতা ও মাতা উভয় ব্যতিরেকেই জন্মগ্রহণ করেন । ইয়াহূদীরা ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের বিরুদ্ধে ইলাহ্ হওয়ার দাবী করার অভিযোগও এনেছিল । কুরআনের অনেক আয়াতে এর বিপরীতে ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের বন্দেগী ও মানবত্বের স্বীকারোক্তি বর্ণিত হয়েছে । চতুর্থ অঙ্গীকারে বলা হয়েছে, অবিশ্বাসীর বিপক্ষে আপনার অনুসারীদের কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখা হবে । আয়াতে অনুসরণের অর্থ ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের নবুওয়াতে বিশ্বাস করা ও স্বীকারোক্তি করা । এর জন্য যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করা শর্ত নয় । এভাবে নাসারা ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় তার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত । কারণ, মুসলিমরাও ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের নবুওয়াতে বিশ্বাসী । এটা ভিন্ন কথা যে, এতটুকু বিশ্বাসই আখেরাতের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করার উপর আখেরাতের মুক্তি নির্ভরশীল । ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের অকাট্য বিধানাবলীর মধ্যে একটি ছিল এই যে, পরবর্তীকালে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও ঈমান আনতে হবে । নাসারারা এটি পালন করেনি । ফলে তারা আখেরাতের মুক্তি থেকে বঞ্চিত । মুসলিমরা এটিও পালন করেছে । ফলে তারা আখেরাতে মুক্তির অধিকারী হয়েছে । পঞ্চম অঙ্গীকার এই যে, কেয়ামতের দিন সব ধর্মীয় মতবিরোধের মীমাংসা করা হবে । সময় এলে এ অঙ্গীকারও পূর্ণ হবে ।

(১) ইয়াহূদীরা একথা বলে যে, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়ে সমাহিত হয়ে গেছেন এবং পরে জীবিত হননি । বর্তমানে নাসারাগণও ইয়াহূদীদের আকীদা-বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে বলে থাকে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম শূলে বিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন । অবশ্য তারা এটাও বলে থাকে যে, তিনি পরে জীবিত হয়ে আবার আকাশে চলে গিয়েছেন । প্রকৃত কথা হলো, ঈসা আলাইহিস সালামকে তারা হত্যা করতে সক্ষম হয়নি । বরং আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের শত্রুদের চক্রান্ত স্বয়ং তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন । অর্থাৎ যেসব ইয়াহূদী তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তির

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন। আর আল্লাহ্ যালেমদেরকে পছন্দ করেন না।

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾

৫৮. এটা আমরা আপনার নিকট তেলাওয়াত করছি আয়াতসমূহ ও হেকমতপূর্ণ বাণী থেকে।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۗ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥٩﴾

৫৯. নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট 'ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তসদৃশ। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন; তারপর তাকে বলেছিলেন, 'হও', ফলে তিনি হয়ে যান।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. (এটা) আপনার রবের নিকট থেকে সত্য, কাজেই আপনি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না[১]।

আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে হুবহু ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের ন্যায় করে দেন। অতঃপর ঈসা 'আলাইহিস্ সালামকে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নেন। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, ﴿وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ "তারা ঈসাকে হত্যা করেনি, শূলীতেও চড়ায়নি। কিন্তু আল্লাহ্র কৌশলে তারা সাদৃশ্যের ধাঁধায় পতিত হয়" [সূরা আন্-নিসাঃ ১৫৭] এভাবে তারা নিজেদের লোককে হত্যা করেই আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

এ দুই দলের বিপরীতে ইসলামের বিশ্বাস আলোচ্য আয়াত ও অন্যান্য কতিপয় আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ইয়াহূদীদের কবল থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নিয়েছেন। তাকে হত্যা করা হয়নি এবং শূলিতেও চড়ানো হয়নি। তিনি জীবিতাবস্থায় আকাশে বিদ্যমান রয়েছেন এবং কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আকাশ থেকে অবতরণ করে ইয়াহূদীদের বিপক্ষে জয়লাভ করবেন, অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। এ বিশ্বাসের উপর সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

(১) এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সূরা আলে-ইমরানে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী রাসূলগণের উল্লেখ প্রসঙ্গে আদম, নূহ্, ইব্রাহীম ও ইমরানের বংশধরের কথা একটি মাত্র আয়াতে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। এরপর প্রায় বাইশটি আয়াতে ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম ও তার পরিবারের উল্লেখ এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে যে,

৬১. অতঃপর আপনার নিকট জ্ঞান আসার | فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ

কুরআন যার প্রতি নাযিল হয়েছে তার উল্লেখও এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের মাতামহীর উল্লেখ, তার মানতের বর্ণনা, জননীর জন্ম, তার নাম, তার লালন-পালনের বিস্তারিত বিবরণ, ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের জননীর গর্ভে আগমন, অতঃপর জন্মের বিস্তারিত অবস্থা, জন্মের পর জননী কি পানাহার করলেন, শিশু সন্তানকে নিয়ে গৃহে আগমন, পরিবারের লোকদের ভর্ৎসনা, জন্মের পরপরই ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের বাকশক্তি প্রাপ্তি, যৌবনে পদার্পণ, স্বজাতিকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান, তাদের বিরোধিতা, সহচরদের সাহায্য, ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র, জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়া প্রভৃতি। এরপর মুতাওয়াতির হাদীসসমূহে তার আরো গুণাবলী, আকার আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণও এমনিভাবে দেয়া হয়েছে যে, সমগ্র কুরআন ও হাদীসে কোন রাসূলের জীবনালেখ্য এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। সামান্য চিন্তা করলেই এ বিষয়টির কারণ পরিস্কার হয়ে যায় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী, তার পর আর কোন নবী আসবেন না। এ কারণে, তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে কেয়ামত পর্যন্ত সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই একদিকে তিনি পরবর্তীকালে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সাধারণ গুণাবলীর মাধ্যমে ও অনেকের বেলায় নাম উল্লেখ করে তাদের অনুসরণ করতে জোর তাকিদ করেছেন। অপরদিকে উম্মতের ক্ষতিসাধনকারী পথভ্রষ্ট লোকদের পরিচয়ও বলেছেন। পরবর্তীকালে আগমনকারী পথভ্রষ্টদের মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হবে দাজ্জাল। তার ফেৎনাই হবে সর্বাধিক বিভ্রান্তিকর। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এত বেশী হাল-হাকীকত বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তার আগমনের সময় সে যে পথভ্রষ্ট, এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ থাকবে না। এমনিভাবে পরবর্তীকালে আগমনকারী সংস্কারক ও অনুসরণযোগ্য মনীষিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নবুওয়াত ও রিসালতের সম্মানে ভূষিত করেছেন; দাজ্জালের ফেৎনার সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্য আকাশে জীবিত রেখেছেন এবং কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাজ্জাল হত্যার জন্য নিয়োজিত হবেন। এ কারণে তার জীবনালেখ্য ও গুণাবলী মুসলিম সম্প্রাদয়ের কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, যাতে তার অবতরণের সময় তাকে চেনার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ ও বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। এর রহস্য ও উপযোগিতা অনেক। প্রথম, তার পরিচয়ে জটিলতা থাকলে তার অবতরণের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। মুসলিম সম্প্রদায় তার সাথে সহযোগিতা করবে না। ফলে তিনি কিভাবে তাদের সাহায্য করবেন? দ্বিতীয়, ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম সে সময় নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট হয়ে জগতে আসবেন না; বরং মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদানের উদ্দেশ্যে আগমন করবেন, কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি স্বীয় নবুওয়াতের পদ থেকে অপসারিতও হবেন না। তৃতীয়, ঈসা 'আলাইহিস্

تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾

পর যে কেউ এ বিষয়ে আপনার সাথে তর্ক করে তাকে বলুন, 'এস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে, আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে, তারপর আমরা মুবাহালা (বিনীত প্রার্থনা) করি, অতঃপর মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্‌র লা'নত[১] ।'

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٢﴾

৬২. নিশ্চয় এগুলো সত্য বিবরণ এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন হক ইলাহ্ নেই । আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনি তো পরম পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।

সালামের অবতরণের ঘটনা দুনিয়ার অন্তিম পর্যায়ে সংঘটিত হবে । এমতাবস্থায় তার অবস্থা ও লক্ষণাদি অস্পষ্ট হলে অন্য কোন প্রতারকের পক্ষ থেকে এরূপও দাবী করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে, আমিই মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম । এখন কেউ এরূপ করলে লক্ষণাদির সাহায্যে তাকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে । উদাহরণতঃ হিন্দুস্থানে এক সময় মির্যা কাদিয়ানী দাবী করে বসে যে, সে-ই প্রতিশ্রুত মসীহ্ । মুসলিম ওলামাগণ এসব লক্ষণের সাহায্যেই তার ভ্রান্ত দাবী প্রত্যাখ্যান করেছেন ।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন । মুবাহালা হলো, যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়, তবে তারা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহ্‌র লা'নতের অধিকারী হয় । মূলত: 'লা'নত' অর্থ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া । আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া মানেই আল্লাহ্‌র ক্রোধে পড়া । এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হোক । এরূপ করার পর যে পক্ষ মিথ্যাবাদী, সে তার প্রতিফল ভোগ করবে । সে সময় সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পরিচয় অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে । এভাবে প্রার্থনা করাকে 'মুবাহালা' বলা হয় । এতে বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করলেই চলে । পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে একত্রিত করার প্রয়োজন নেই । কিন্তু একত্রিত করলে এর গুরুত্ব বেড়ে যায় ।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

৬৩. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের সম্পর্কে সম্যক অবগত(১)।

সপ্তম রুকূ'

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪. আপনি বলুন, হে আহ্‌লে কিতাবগণ! এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি, তাঁর সাথে কোন কিছুকে

(১) এ 'মুবাহালা'র পটভূমি সম্পর্কে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নাজরানের নাসারাদের মধ্য হতে 'আকেব ও আস-সাইয়্যেদ নামীয় দুই নেতা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে [তাদের ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে কোন্‌টি সঠিক তা নির্ধারণের ব্যাপারে] মুলা'আনাহ করার ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করল। তারপর তাদের একজন অপরজনকে বলল, এটা করতে যেয়ো না; কারণ, আল্লাহ্‌র শপথ, যদি তিনি নবী-ই হয়ে থাকেন এবং আমাদেরকে বদ-দো'আ করেন, তাহলে আমরা ও আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কখনো সফলকাম হতে পারবো না। তারপর তারা দু'জন [পূর্ববর্তী মুবাহালা করার মত থেকে সরে এসে] এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, আপনি আমাদের কাছে যা চাইবেন তা-ই আমরা দিব, তবে আপনি আমাদের কাছে একজন আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠান। আমানতদার ব্যক্তি ব্যতীত কাউকে পাঠাবেন না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের সাথে বাস্তবিকই একজন আমানতদার ব্যক্তিকেই পাঠাব। এ কথা বলার পর সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই সেই আমানতদার ব্যক্তিটি হবার ব্যাপারে উৎসাহী হলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ! তুমি উঠ।" যখন তিনি দাঁড়ালেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এই হচ্ছে এ উম্মতের আমানতদার ব্যক্তি।" [বুখারী: ৪৩৮০, মুসলিম: ২৪২০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবন আব্বাস বলেন, "যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুবাহালাহ করতে চেয়েছিল তারা যদি তা করত তবে তারা ফিরে গিয়ে কোন সম্পদ-পরিবার খুজে পেত না।" [তিরমিযী: ৩৩৪৫, মুসনাদে আহমাদ ১/২৪৮]

ইবন কাসীর বলেন, এ ঘটনা হিজরী ৯ম সনে সংঘটিত হয়েছিল। তার পূর্বেই জিযিয়া করের বিধান সম্বলিত সূরা আত-তাওবাহ্ এর আয়াত নাযিল হয়েছিল। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

শরীক না করি এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ছাড়া একে অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ না করি।' তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয় আমরা মুসলিম[১]।'

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوۡرَىٰةُ وَٱلۡإِنجِيلُ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِهِۦٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ٦٥

৬৫. হে আহ্লে কিতাবগণ! ইব্রাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইঞ্জীল তো তার পরেই নাযিল হয়েছিল? সুতরাং তোমরা কি বুঝ না[২]?

(১) এ আয়াত থেকে দ্বীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোর একটি মূলনীতি জানা যায়। তা এই যে, ভিন্ন মতাবলম্বী কোন দলকে দ্বীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানাতে হলে প্রথমে তাকে শুধু এমন বিষয়ের প্রতিই আহ্বান জানানো উচিত, যে বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোম সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন এমন বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে উভয়েই একমত ছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ। আমন্ত্রণ লিপিতে লিখা হয়েছিলঃ 'আমি আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি- যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। এ পত্র আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। যে হেদায়াতের পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। মুসলিম হয়ে যান; শান্তি লাভ করবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর যদি বিমুখ হন, তবে আপনার প্রজা সাধারণের গোনাহ্ আপনার উপর পতিত হবে। "হে আহলে কিতাবগণ! এমন এক বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। তা এই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদাত করব না। তাঁর সাথে অংশীদার করব না এবং আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্যকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করব না।" [বুখারীঃ ৭]

(২) এ আয়াতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আহলে কিতাবদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিষয়টি বর্ণিত হয় নি। তবে অন্য স্থানে সেটি এভাবে বিবৃত হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাদের ঝগড়ার কারণ হচ্ছে, প্রত্যেকেই তাকে তাদের দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করছে। ইয়াহূদীরা বলে যে, ইবরাহীম ইয়াহূদী ছিলেন। আর নাসারারা বলে যে, তিনি নাসরানী ছিলেন। এর প্রমাণ আল্লাহ্র বাণী: "তোমরা কি বল যে, 'অবশ্যই ইব্রাহীম, ইস্মা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তাঁর বংশধরগণ ইয়াহূদী বা নাসারা ছিল?' বলুন, 'তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্?" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৪০] তবে পরবর্তী ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাবদের

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. সাবধান, তোমরা তো সে সব লোক, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে সে বিষয়ে তোমরা তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আর আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না।

مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. ইব্রাহীম ইয়াহূদীও ছিলেন না, নাসারাও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِىُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

৬৮. নিশ্চয় মানুষের মধ্যে তারাই ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠতম যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এ নবী ও যারা ঈমান এনেছে; আর আল্লাহ্ মুমিনদের অভিভাবক[১]।

বিবাদের বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। কারণ সেখানে বলা হয়েছে, "ইব্রাহীম ইয়াহূদীও ছিলেন না, নাসারাও ছিলেন না"।

হাদীসে এসেছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মতে, নাজরানের নাসারা ও মদীনার ইয়াহূদী সর্দাররা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে একত্রিত হয়ে বিবাদে লিপ্ত হলো। ইয়াহূদীরা বলতে লাগল যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইয়াহূদী ছিলেন, আর নাসারারা বলতে লাগল যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নাসরানী ছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন যে, তোমাদের কি হলো যে, একটি প্রকাশ্য বিষয়কে ভিন্ন রূপ দিচ্ছ? তাওরাত ও ইঞ্জীল তো ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরে নাযিল হয়েছে। আর সে কিতাবদ্বয়ের নাযিলের পরে ইয়াহূদীবাদ ও খ্রীস্টানবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাহলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কিভাবে ইয়াহূদী বা নাসারা হতে পারে? [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) অর্থাৎ ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালামকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতম হলেন যারা তার আনীত দ্বীনের উপর আছেন ও এই নবী অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং এই নবীর উম্মাতদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে অর্থাৎ মুহাজির-আনসার ও অন্যান্য পরবর্তী উম্মাত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'প্রত্যেক নবীরই নবীদের মধ্য থেকে কিছু অভিভাবক থাকেন। আমার অভিভাবক হলেন আমার পিতা, আমার রবের খলীল (অর্থাৎ ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম)।' [তিরমিযীঃ ২৯৯৮, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/২৯২, ৫৫৩]

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ۭ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৬৯. কিতাবীদের একদল চায় যেন তোমাদেরকে বিপথগামী করতে পারে, অথচ তারা নিজেদেরকেই বিপথগামী করে। আর তারা উপলব্ধি করে না।

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝

৭০. হে কিতাবীরা! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সাথে কুফরী কর, যখন তোমরাই সাক্ষ্য বহন কর(১)?

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৭১. হে কিতাবীরা! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর(২) এবং সত্য গোপন কর, যখন তোমরা জান(৩)?

(১) কাতাদা বলেন, এর অর্থ, হে কিতাবী সম্প্রদায়! কিভাবে তোমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করতে পার, অথচ তোমরা সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাগুণ তোমাদের কিতাবে রয়েছে। তারপর তোমরা তার সাথে কুফরী কর, তা অগ্রাহ্য কর এবং তার উপর ঈমান আনয়ন কর না। তোমরা তোমাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে তাকে উম্মী নবী হিসেবে দেখতে পাও, যিনি আল্লাহ্‌র উপর এবং তার কালেমার উপর ঈমান রাখেন। [তাবারী]

(২) ইবনে আব্বাস বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুছ ছাইফ, আদী ইবন যায়দ ও হারেস ইবন আওফ পরস্পর পরস্পরকে বলল: আস, যা মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের উপর নাযিল হয়েছে আমরা সেটার উপর সকালবেলায় ঈমান আনয়ন করি এবং সন্ধ্যা বেলা সেটার সাথে কুফরী করি। যাতে করে মুসলিমরা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহে ঘুরপাক খেতে থাকে। ফলে আমরা যে রকম করেছি তারাও সে রকম করবে। আর এতে করেই তারা তাদের দ্বীন থেকে সরে আসবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। [তাবারী]

কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ্ এখানে 'তোমরা কেন হককে বাতিলের বা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর' এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা কেন ইসলামের সাথে ইয়াহূদী মতবাদ ও খ্রীস্টানদের মতবাদকে মিলিয়ে মিশিয়ে দেখছ? অথচ তোমরা ভাল করেই জান যে, যে দ্বীন ব্যতীত আর কোন কিছু আল্লাহ্ কবুল করবেন না, আর কোন প্রতিফল কেউ পাবে না, সেটি হচ্ছে ইসলাম। [তাবারী]

(৩) কাতাদা বলেন, জেনে-বুঝে সত্য গোপন করার অর্থ হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিষয়টি তারা গোপন করছে। অথচ তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাদের তাওরাত ও ইঞ্জীলে আলোচনা ও গুণাগুণ দেখতে পায়। যিনি সৎকাজের আদেশ করবেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবেন। [তাবারী]

অষ্টম রুকূ'

وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ ءَامِنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا۟ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. আর কিতাবীদের একদল বলল, 'যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তোমরা দিনের শুরুতে তাতে ঈমান আন এবং দিনের শেষে কুফরী কর; যাতে তারা ফিরে আসে(১)।

وَلَا تُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰٓ أَحَدٌ مِّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর যে তোমাদের দ্বীনের অনুসরণ করে তাদেরকে ছাড়া আর কাউকেও বিশ্বাস করো না(২)।' বলুন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ। এটা এ জন্যে যে তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে অনুরূপ আর কাউকেও দেয়া হবে অথবা তোমাদের রবের সামনে তারা তোমাদের সাথে বিতর্ক করবে(৩)।' বলুন, 'নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছে তা প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'

(১) কাতাদা বলেন, ইয়াহূদীরা একে অপরকে বলত: তাদের দ্বীনের ব্যাপারে দিনের শুরুতে সন্তোষ প্রকাশ কর। আর দিনের শেষে অস্বীকার কর। এতে করে মুসলিমরা তোমাদেরকে সত্যয়ন করবে এবং বুঝে নিবে যে, নিশ্চয় তোমরা মুসলিমদের মাঝে এমন কিছু দেখেছ যা অপছন্দনীয়। আর এভাবেই সহজে মুসলিমরা তাদের দ্বীন ছেড়ে দিয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। [তাবারী]

(২) এটাও কিতাবীরা পরস্পরকে বলে। তারা এর মাধ্যমে শিখিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা কখনও কোন মুসলিমকে বিশ্বাস করে তোমাদের গোপন মনের কথা বলে দিও না। এতে তারা সাবধান হয়ে যাবে। [তাফসীরে ইবন কাসীর]

(৩) মুজাহিদ বলেন, অর্থাৎ তাদের এসব কর্মকাণ্ডের মূল কারণ হচ্ছে, ইয়াহূদীরা তাদের ছাড়া অন্যদের মাঝে নবুওয়ত আসবে বা অন্যদের মত তারাও একইভাবে কোন দ্বীনের অনুসারী হবে, এটা সহ্য করতে পারছে না। ফলে হিংসা তাদেরকে ঈমান আনতে বাধা দিচ্ছে। কাতাদা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের সম্বোধন করে বলছেন, যখন আল্লাহ্ অন্যদের প্রতি তোমাদের কিতাবের মত কিতাব নাযিল করল এবং তোমাদের নবীর মত নবী অন্যদেরকেও প্রদান করল তখনি তোমরা হিংসা আরম্ভ করলে। [তাবারী]

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾

৭৪. তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাকে ইচ্ছে একান্ত করে বেছে নেন(১)। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও ফেরত দেবে(২); আবার এমন লোকও আছে যার কাছে একটি দিনার আমানত রাখলেও তার উপর সর্বোচ্চ তাগাদা না দিলে সে তা ফেরত দেবে না। এটা এ কারণে যে, তারা বলে, 'উম্মীদের ব্যাপারে আমাদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নেই'(৩) আর তারা জেনে-বুঝে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা বলে।

---

(১) অনুগ্রহ বলতে যাবতীয় অনুগ্রহই উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে তাফসীরবিদ মুজাহিদের মতে, এখানে অনুগ্রহ বলে নবুওয়াত বোঝানো হয়েছে। কারণ, পূর্বের আয়াতে এ কারণেই ইয়াহূদীরা হিংসা করে ঈমান আনতে বিরত থাকছে বলে জানানো হয়েছে। [তাবারী]

(২) এ আয়াতে আমানতে বিশ্বস্তদের প্রশংসা করা হয়েছে। আয়াতে 'কিছু সংখ্যক লোক' বলে যদি ঐসব আহলে-কিতাবকে বুঝানো হয়ে থাকে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে এ প্রশংসায় কোনরূপ জটিলতা নেই। কিন্তু যদি সাধারণ আহলে-কিতাব বুঝানো হয়ে থাকে, যারা অমুসলিম, তবে প্রশ্ন হয় যে, কাফেরের কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নয়; এমতাবস্থায় তার প্রশংসার অর্থ কি? উত্তর এই যে, প্রশংসা করলেই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া বুঝায় না। এখানে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, ভাল কাজ কাফেরের হলেও তা এক পর্যায়ে ভালই। সে এর উপকার দুনিয়াতে সুখ্যাতির আকারে পাবে। এ বর্ণনায় একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা নেই, বরং সে খোলা মনে প্রতিপক্ষের সদগুণাবলীরও প্রশংসা করে।

(৩) কাতাদা বলেন, ইয়াহূদীরা বলত: আরবদের যে সমস্ত সম্পদ আমাদের হস্তগত হবে সেটা ফেরত দেয়ার কোন সুযোগ নেই। [তাবারী] বস্তুত ইয়াহূদীরা তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য সকল মানুষকে 'উমামী' বা 'জুয়ায়ী' ইত্যাদি নাম দিয়ে থাকে। তারা মনে করে যে, তারাই আল্লাহ্র একমাত্র পছন্দনীয় জাতি। তারা ব্যতীত আর কারও জান বা মালের কোন সম্মান থাকতে পারে না।

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

৭৬. হ্যাঁ অবশ্যই, কেউ যদি তার অংগীকার পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন(১)।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৭৭. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্র সাথে করা প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য খরিদ করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই(২)। আর আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এখানে তাকওয়া বলে শির্ক থেকে বেঁচে থাকা বোঝানো হয়েছে। যারা শির্ক থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসেন। [তাবারী]

(২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ এক ব্যক্তি তার পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারে দাঁড়িয়ে শপথ করে বলল, 'আল্লাহ্র শপথ! আমাকে এর চেয়ে বেশী মূল্য দিতে চেয়েছিল' অথচ তা সত্য ছিল না, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন মুসলিমকে বিভ্রান্ত করে তার পণ্য গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। তখন এ আয়াত নাযিল হল। [বুখারীঃ ২০৮৮] আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফা বলেন, দালালমাত্রই সুদখোর ও খেয়ানতকারী। [বুখারী] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। এক. কোন লোকের অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও কোন মুসাফিরকে দিতে নিষেধ করেছে। দুই. কোন লোক রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে কেবলমাত্র দুনিয়ালাভের জন্যই আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছে। ফলে তাকে দুনিয়ার কোন সম্পদ দেয়া হলে সে সন্তুষ্ট থাকে, না দেয়া হলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তিন. ঐ ব্যক্তি যে আসরের পরে তার পণ্য বিক্রির জন্য বিছিয়ে নিয়েছে, তারপর বলতে থাকে যে, আল্লাহ্র শপথ! আমাকে (পূর্বে) এ পণ্যের জন্য এত এত দেয়ার কথা বলেছে (অর্থাৎ লোকেরা এর দাম এত এত বলেছে)। আর এটা শুনে কোন লোক তাকে সত্যবাদী মনে করে নিয়েছে (এবং তা ক্রয় করে নিয়েছে)। তারপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [বুখারী: ২৩৫৮; মুসলিম: ১০৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কেউ যদি জেনে-বুঝে কোন মুসলিমের সম্পদ কুক্ষিগত করার মানসে মিথ্যা শপথ করে, সে আল্লাহ্র সাথে ক্রোধান্বিত অবস্থায় সাক্ষাত করবে।" তখন আল্লাহ্ তাঁর নবীর সত্যায়নের জন্য উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। [বুখারী: ৪৫৪৯, ৪৫৫০; মুসলিম: ১৩৩৮]

তাকাবেন না কেয়ামতের দিন। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না; এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি(১)।

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ ۚ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আর নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একদল আছে যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাতে তোমরা সেটাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের অংশ মনে কর; অথচ সেটা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে, 'সেটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে'; অথচ সেটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনে-বুঝে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা বলে(২)।

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا۟ عِبَادًا لِّى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا۟ رَبَّٰنِيِّۧنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

৭৯. কোন ব্যক্তির জন্য সঙ্গত নয় যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব, হেকমত ও নবুওয়াত দান করার পর তিনি মানুষকে বলবেন, 'আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও'(৩), বরং তিনি

(১) আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দু পক্ষের মধ্যে যা সাব্যস্ত হয় এবং যা পূর্ণ করা উভয় পক্ষের জন্য জরুরী, এমন বিষয়কে অঙ্গীকার বলা হয়। ওয়াদা শুধু এক পক্ষ থেকে হয়। অতএব, অঙ্গীকার ব্যাপক এবং ওয়াদা সীমিত। কুরআন ও সুন্নায় অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপরোল্লেখিত আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে পাঁচটি সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছেঃ (এক) জান্নাতের নেয়ামতসমূহে তার কোন অংশ নেই। (দুই) আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে অনুকম্পাসূচক কথা বলবেন না। (তিন) কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রহ্‌মতের দৃষ্টিতে দেখবেন না। (চার) আল্লাহ্ তা'আলা তার পাপ মার্জনা করবেন না। কেননা, অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে বান্দার হক নষ্ট হয়েছে। বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহ্ মার্জনা করেন না। (পাঁচ) তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।

(২) কাতাদা ও মুজাহিদ বলেন, যারা এ গর্হিত কাজটি করে তারা হচ্ছে, ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে বিকৃত করে সেখানে মনগড়া কথা ঢুকিয়ে নিয়েছে, তারপর তারা সেটাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলে দাবী করছে। [তাবারী]

(৩) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যখন নাজরানের নাসারারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হলো, সেখানে ইয়াহূদী

বলবেন, 'তোমরা রব্বানী[১] হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।'

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

৮০. অনুরূপভাবে ফেরেশ্‌তাগণ ও নবীগণকে রবরূপে গ্রহণ করতে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দেন না। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দেবেন?

নবম রুকূ'

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ

৮১. আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন[২] যে,

---

ও নাসারা সবাই একত্রিত হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন, তখন আবু রাফে' আল-কুরাযী বলে বসল: হে মুহাম্মাদ! আপনি কি চান যে, নাসারারা যেভাবে ঈসা ইবন মারইয়ামের ইবাদাত করে থাকে, সেভাবে আমরাও আপনার ইবাদাত করি? তখন নাসারাদের একজন যাকে 'আর-রায়িস' বলা হয় সে দাঁড়িয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি কি তা-ই চান? আর এটাই আপনার দাওয়াত? অথবা এরকম কোন কথা বলল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদত করা বা আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারও ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানাবো এমন কাজ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ আমাকে এ জন্য পাঠান নি। অথবা এরকম কোন কথা তিনি বললেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন। [তাবারী]

(১) 'রব্বানী' শব্দের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত এসেছে। ইবনে আব্বাস থেকে এক বর্ণনায় এর অর্থ এসেছে, حُكَمَاء عُلَمَاء حُلَمَاء অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী ও সহিষ্ণু হওয়া। হাসান বসরী বলেন, ফকীহ হওয়া। অন্য বর্ণনায় ইবন আব্বাস, সা'য়ীদ ইবন জুবাইর, কাতাদাহ, আতা সহ অনেকের মতে এর অর্থ ইবাদত ও তাকওয়ার অধিকারী হওয়া। [ইবন কাছীর] এগুলোতে কোন বিরোধ নেই। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ্ বলেন: এ শব্দটি رُبَّانُ السَّفِينَةِ (জাহাজের নাবিক) শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ কর্ণধার, পরিচালক, বিপদে নেতৃত্বপ্রদানকারী। [মাজমূ' ফাতাওয়া]

(২) আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার কাছ থেকে তিনটি অঙ্গীকার নিয়েছেন। একটি সূরা আল-আ'রাফের ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সে অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র মানবজাতি আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও রবুবিয়াতে বিশ্বাসী হবে। দ্বিতীয় অঙ্গীকার শুধু আহলে-কিতাব পণ্ডিতদের কাছ থেকেই নেয়া হয়েছে, যাতে তারা সত্য গোপন না

مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ ؕ قَالُوْۤا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾

আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি; তারপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসূল আসবে- তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এর উপর আমার অংগীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম(১)।'

করে। যার আলোচনা ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ﴾ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। [সূরা আলে ইমরানঃ ১৮৭] অনুরূপভাবে এ অঙ্গীকারের কথা সূরা আল-বাকারাহ্‌র ৮৩ এবং সূরা আল-মায়েদার ১২ ও ৭০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় অঙ্গীকার আলোচ্য ৮১ নং আয়াতে ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ ميثاق বা অঙ্গীকার কি? এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। আলী ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সব রাসূলগণের কাছ থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অঙ্গীকার নেন যে, তারা স্বয়ং যদি তার আমলে জীবিত থাকেন, তবে যেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাকে সাহায্য করেন। স্বীয় উম্মতকেও যেন এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যান। [তাবারী] পক্ষান্তরে তাউস, হাসান বসরী, কাতাদাহ্ প্রমুখ তফসীরবিদগণ বলেনঃ রাসূলগণের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল- যাতে তারা পরস্পরকে সাহায্য ও সমর্থন দান করেন। [তাবারী] বস্তুত উভয় তাফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ কারণে আয়াতের অর্থ উভয়টিই হতে পারে।

(১) আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব রাসূলের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেন যে, আপনাদের মধ্য থেকে কোন রাসূলের পর যখন অন্য রাসূল আগমন করেন- যিনি অবশ্যই পূর্ববর্তী রাসূল ও আল্লাহ্‌র গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী হবেন, তখন পূর্ববর্তী নবীর জন্যে জরুরী হবে নতুন নবীর সত্যতা ও নবুওয়তের প্রতি নিজে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অন্যকেও বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ দিয়ে যাওয়া। কুরআনের এ সামগ্রিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেও এমনি ধরনের অঙ্গীকার পূর্ববর্তী রাসূলগণের কাছ থেকে নিয়ে থাকবেন। তাই যখন ঈসা 'আলাইহিস্ সালাম

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. সুতরাং এরপর যারা মুখ ফিরাবে তারাই তো ফাসেক।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. তারা কি চায় আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে(১)! আর তাঁর দিকেই তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

পৃথিবীতে পুনরায় নেমে আসবেন, তখন তিনিও কুরআন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধি-বিধানই পালন করবেন। এতে বুঝা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত বিশ্বজনীন। তার শরীয়তের মধ্যে পূর্ববর্তী সব শরীয়ত পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন, ‘আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি’ [বুখারী: ৪৩৮; অনুরূপ মুসলিম: ৫২১]

(১) ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পন সমস্ত সৃষ্টিকেই করতে হয়। প্রতিটি সৃষ্টি জীবই আল্লাহ্‌র নিয়মের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য। তাকে অবশ্যই মরতে হবে। তাকে অবশ্যই কষ্ট স্বীকার করতে হবে। তাকে অবশ্যই রোগ-বালাই এর সম্মুখীন হতে হবে, ইত্যাদি। কিন্তু তারা সবাই তা মন বা মুখে স্বীকার করতে চায় না। বা স্বীকার করে আল্লাহ্‌র কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতি স্বীকার করে না। সকল সৃষ্টজীবই এ প্রকার আত্মসমর্পনের অধীন। এ ধরনের আত্মসমর্পনের মধ্যে কোন সওয়াব নেই। তবে এদের মধ্যে একদল আছে যারা আল্লাহ্‌র এ নিয়ম-নীতি প্রত্যক্ষ করে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে এবং স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তাঁর আনুগত্য করেছে। এ প্রকার আত্মসমর্পনই আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর বান্দার কাছে আশা করেন। এর মধ্যেই রয়েছে সওয়াব ও মুক্তি। [তাবারী] এ আয়াতে যে বক্তব্যটি বলা হচ্ছে পবিত্র কুরআনে এ ধরনের বক্তব্য আরও এসেছে, যেমন বলা হয়েছে, “আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয় আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল ও সন্ধ্যায়” [সূরা আর-রা‘দ: ১৫] আরও এসেছে,“তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়? আল্লাহ্‌কেই সিজ্‌দা করে যা কিছু আছে আসমানসমূহে ও যমীনে, যত জীবজন্তু আছে সেসব এবং ফিরিশ্‌তাগণও, তারা অহংকার করে না। আর তারা ভয় করে তাদের উপর তাদের রবকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা করে।” [আন-নাহল:৪৮-৫০]

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. বলুন, 'আমরা আল্লাহ্‌তে ও আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং ইব্‌রাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা নাযিল হয়েছিল এবং যা মূসা, 'ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছিল তাতে ঈমান এনেছি; আমরা তাঁদের কারও মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।'

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. আল্লাহ্ কিভাবে হেদায়াত করবেন সে সম্প্রদায়কে, যারা ঈমান আনার পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর কুফরী করে? আর আল্লাহ্ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না[১]।

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, আনসারদের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে যায় এবং মুশরিকদের সাথে মিশে যায়। পরে সে লজ্জিত হয় ও তার স্বজাতির কাছে বলে পাঠায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা কর আমার কি কোন তাওবাহ্ আছে? তার স্বজাতির লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে, অমুক লজ্জিত হয়েছে এবং জানতে চেয়েছে যে, তার জন্য তাওবাহ্ আছে কি না? তখন এ আয়াতসহ পরবর্তী চারটি আয়াত নাযিল হয়। পরে সে ফিরে আসে এবং পুনরায় ইসলামে প্রবেশ করে। [নাসায়ী: ৭/১০৭; সহীহ ইবনে হিব্বান: ৪৪৭৭; মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৪৮] হাসান বলেন, এ আয়াত দ্বারা আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাদের গ্রন্থে

أُولَٰئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾

৮৭. এরাই তারা যাদের প্রতিদান হলো, তাদের উপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশ্‌তাগণের এবং সকল মানুষের লা'নত।

خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮. তারা তাতে স্থায়ী হবে, তাদের শাস্তি শিথিল করা হবে না এবং তাদেরকে বিরামও দেয়া হবে না;

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٨٩﴾

৮৯. কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা এর পরে তাওবাহ্ করেছে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নিয়েছে। তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ ﴿٩٠﴾

৯০. নিশ্চয় যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে তারপর তারা কুফরীতে বেড়ে গিয়েছে তাদের তওবা কখনো কবুল করা হবে না। আর তারাই পথ ভ্রষ্ট(১)।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا

৯১. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কাফেররূপে মৃত্যু ঘটেছে তাদের কারো কাছ থেকে যমীনভরা সোনা

স্পষ্ট দেখতে পেত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে তিনি তাদের কাছে আগমন করলে তাকে সাথে নিয়ে কাফেরদের উপর জয়ী হবে ঘোষণা করত। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে আসলেন, তখন তারা কূফরী করল। [তাবারী] তবে আয়াত দৃষ্টে মনে হয়; বক্তব্যটি ব্যাপক। যারাই এরকম কাজ করবে তারাই এ খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে।

(১) কাতাদা বলেন, তারা হচ্ছে আল্লাহ্‌র দুশমন ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তারা ইঞ্জীল ও ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে কুফরী করেছে। তারপর তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের সাথে কুফরী করছে। [তাবারী] সুতরাং তাদের জন্যই অপেক্ষা করছে ভয়াবহ পরিণতি। তাদের তাওবাহ কবুল হওয়ার নয়। আবুল আলীয়া বলেন, তাদের তাওবাহ কবুল না হওয়ার কারণ হচ্ছে, তারা কোন কোন গোনাহ হতে তাওবাহ করলেও মূল গোনাহ (কুফরী) থেকে তাওবাহ করে না। সুতরাং তাদের তাওবাহ কিভাবে কবুল হবে? [ইবন আবী হাতেম]

وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝٩١

বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনো কবুল করা হবে না[১]। এরাই তারা, যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে; আর তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

দশম রুকূ'

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝٩٢

৯২. তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করবে না। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবগত[২]।

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে উপস্থিত করে বলা হবেঃ যদি তোমার নিকট পৃথিবীর সমান পরিমান স্বর্ণ থাকে, তাহলে কি তুমি এর বিনিময়ে এ শাস্তি থেকে মুক্তি কামনা করবে? তখন তারা বলবেঃ হ্যাঁ, তাকে বলা হবে যে, তোমার নিকট এর চেয়েও সহজ জিনিস চাওয়া হয়েছিল... আমার সাথে আর কাউকে শরীক না করতে কিন্তু তুমি তা মানতে রাজি হওনি। [বুখারীঃ ৬৫৩৮]

(২) সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন কুরআনী নির্দেশের প্রথম সম্বোধিত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষ সঙ্গী। কুরআনী নির্দেশ পালনের জন্য তারা ছিলেন উন্মুখ। আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সহায় সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করলেন যে, কোনটি তাদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এরপর আল্লাহ্র পথে তা ব্যয় করার জন্যে তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করতে লাগলেন। মদীনার আনসারগণের মধ্যে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বেশ ধনী ছিলেন। মসজিদে নববী সংলগ্ন বিপরীত দিকে তার একটি বাগান ছিল, যাতে 'বীরাহা' নামে একটি কুপ ছিল। বর্তমানে মাসজিদের নববীর বাব আল-মাজীদীর বাদশাহ ফাহদ গেট দিয়ে ভিতরে মাসজিদে ঢুকার পর পরই সামান্য বাম পার্শ্বে এ স্থানটি পড়ে। পরিচিতির সুবিধার্থে দুই থামের মাঝখানের তিনটি গোল চক্কর দিয়ে তার স্থান নির্দেশ করা আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝে এ বাগানে পদার্পণ করতেন এবং বীরহা কূপের পানি পান করতেন। এ কুপের পানি তিনি পছন্দও করতেন। আবু তালহার এ বাগান অত্যন্ত মূল্যবান, উর্বর এবং তার বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বললেনঃ আমার সব বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে বীরহা আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আমি এটি

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَىٰةُ قُلۡ فَأۡتُواْ بِٱلتَّوۡرَىٰةِ فَٱتۡلُوهَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٩٣

৯৩. তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে ইস্‌রাঈল তার নিজের উপর যা হারাম করেছিল[১] তা ছাড়া বনী ইস্‌রাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল[২]। বলুন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং তা পাঠ কর।'

فَمَنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٩٤

৯৪. এরপরও যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করে তারাই যালেম।

قُلۡ صَدَقَ ٱللَّهُۗ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٩٥

৯৫. বলুন, 'আল্লাহ্‌ সত্য বলেছেন। কাজেই তোমরা একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রাহীমের মিল্লাত অনুসরণ কর, আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।'

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে চাই। আপনি যে কাজে পছন্দ করেন, এটি তাতেই খরচ করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ বিরাট মুনাফার এ বাগানটি আমার মতে তুমি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দাও। আবু তালহা এ পরামর্শ গ্রহণ করেন। [বুখারীঃ ১৪৬১, মুসলিমঃ ৯৯৮] এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, শুধু ফকীর-মিসকীনকে দিলেই পুণ্য হয় না- পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করাও বিরাট পুণ্য ও সওয়াবের কাজ।

(১) আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ ইয়াকূব 'আলাইহিস্‌ সালামের 'ইরকুন্‌ নাসা' নামক রোগ ছিল। এজন্য তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, যদি তিনি এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন তাহলে তিনি উটের গোশ্‌ত ভক্ষণ ত্যাগ করবেন। আয়াতে এ ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/২৯২]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিতর্কের বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে এসেছে- ইয়াহূদীরা আপত্তি করল যে, আপনারা উটের গোশত খান, দুধ পান করেন। অথচ এগুলো ইব্‌রাহীম 'আলাইহিস্‌ সালামের প্রতি হারাম ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেনঃ ভুল কথা, এগুলো তার প্রতি হালাল ছিল। ইয়াহূদীরা বললঃ আমরা যেসব বস্তু হারাম মনে করি, সবই নূহ্‌ ও ইব্‌রাহীমের আমল থেকেই হারাম হিসাবে চলে এসেছে এবং আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ কথোপকথনের পর আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে ইয়াহূদীদের মিথ্যাবাদিতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বলা হচ্ছেঃ তাওরাত নাযিলের পূর্বে উটের গোশত ব্যতীত সব খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং বনী-ইস্‌রাঈলের জন্যও হালাল ছিল। তবে উটের গোশত বিশেষ কারণবশতঃ ইয়াকূব আলাইহিস্‌ সালাম নিজেই নিজের জন্য নিষিদ্ধ করে নিয়েছিলেন। [দেখুন, তাফসীরে ইবন কাসীর]

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

৯৬. নিশ্চয় মানব জাতির(১) জন্য সর্বপ্রথম(২) যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, বরকতময় ও সৃষ্টিজগতের দিশারী হিসাবে।(৩)

(১) প্রাচীনকাল থেকেই কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। আয়াতে ﴿وُضِعَ لِلنَّاسِ﴾ শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানবগোষ্ঠী এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রকৃতিতে এমন মাহাত্ম্য নিহিত রেখেছেন যে, মানুষের অন্তর আপনা-আপনিই এর দিকে আকৃষ্ট হয়।

(২) আলোচ্য আয়াতে কাবাগৃহের শ্রেষ্ঠত্বের কয়েকটি বিশেষ দিক বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ এটি সারা বিশ্বে সর্বপ্রথম ইবাদাতের স্থান। দ্বিতীয়তঃ এ গৃহ বরকতময় ও কল্যাণের আধার। তৃতীয়তঃ এ গৃহ সারা সৃষ্টির জন্য পথপ্রদর্শক। আয়াতে বর্ণিত প্রথম শ্রেষ্ঠত্বের সারমর্ম এই যে, মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা হয়, তা ঐ গৃহ, যা 'বাক্কা'য় অবস্থিত। 'বাক্কা' শব্দের অর্থ মক্কা। এখানে 'মীম' অক্ষরকে 'বা' অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। অথবা উচ্চারণ ভেদে অপর নাম 'বাক্কা'। অতএব কা'বা গৃহই বিশ্বের সর্বপ্রথম ইবাদাতঘর। তখন অর্থ হবে, মানুষের বসবাসের গৃহ পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল; কিন্তু ইবাদাতের জন্য কা'বা গৃহই সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল। এ মতটি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকেও বর্ণিত রয়েছে। [দিয়া আল-মাকদেসী, আল-মুখতারাহ: ২/৬০ নং ৪৩৮] তাছাড়া আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ ইবাদাতের জন্যই নির্মিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে কোন উপাসনালয়ও ছিল না এবং বাস গৃহও ছিল না। এ কারণে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী প্রমুখ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে কা'বাই বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ। তবে প্রথম অর্থটিই অধিক গ্রহণযোগ্য মত।

(৩) আলোচ্য আয়াত দ্বারা কা'বা গৃহের একটি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো যে, এ হচ্ছে জগতের সর্বপ্রথম গৃহ। হাদীসে আছে, আবু যর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করেন যে, জগতের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? উত্তর হলোঃ মসজিদুল হারাম। আবারো প্রশ্ন করা হলোঃ এরপর কোন্‌টি? উত্তর হলোঃ মসজিদে বায়তুল-মুকাদ্দাস। আবার জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই দু'টি মসজিদ নির্মাণের মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান ছিল? উত্তর হলোঃ চল্লিশ বৎসর। [বুখারীঃ ৩৩৬৬, মুসলিমঃ ৫২০] এ হাদীসে ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালামের হাতেই কা'বা গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল বলে বুঝা যায়। তাই সবচেয়ে প্রামাণ্য সঠিক মত হলো যে, ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালামই সর্ব প্রথম কাবা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। কারণ এ হাদীসে বায়তুল-মুকাদ্দাস নির্মাণের ব্যবধান বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, বায়তুল-মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মাণও ইব্‌রাহীম

'আলাইহিস্ সালামের হাতে কা'বা গৃহ নির্মাণের চল্লিশ বৎসর পর সম্পন্ন হয়। এরপর সুলাইমান 'আলাইহিস্ সালাম বায়তুল-মুকাদ্দাসের পুণঃনির্মাণ করেন। এভাবে বিভিন্ন হাদীসের পরস্পর বিরোধিতা দূর হয়ে যায়। এ ছাড়া কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, কা'বা গৃহ সর্বপ্রথম আদম আলাইহিস্ সালাম নির্মাণ করেছেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, 'আদম আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক নির্মিত এ কা'বা গৃহ নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের মহাপ্লাবন পর্যন্ত অক্ষত ছিল। মহাপ্লাবনে এ গৃহ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অতঃপর ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালাম প্রাচীন ভিত্তির উপর এ গৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। উপরোক্ত দু'টি বর্ণনার কোনটিই সঠিক সনদে প্রমাণিত হয়নি। তাই আমরা কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের ভিত্তিতে ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালামকেই কা'বা গৃহের প্রথম নির্মাণকারী বলতে পারি। পরবর্তীকালে এক দুর্ঘটনায় প্রাচীর ধ্বসে গেলে জুরহাম গোত্রের লোকেরা একে পুনঃনির্মাণ করেন। এভাবে কয়েক বার বিধ্বস্ত হওয়ার পর একবার আমালেকা সম্প্রদায় ও একবার কুরাইশরা এ গৃহ নির্মাণ করে। সর্বশেষ এ নির্মাণে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও শরীক ছিলেন এবং তিনিই 'হাজরে-আসওয়াদ' স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কুরাইশদের এ নির্মাণের ফলে ইব্রাহীমী ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথমতঃ কা'বার একটি অংশ 'হাতীম' কা'বা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ ইব্রাহীম 'আলাইহিস্ সালামের নির্মাণে কা'বা গৃহের দরজা ছিল দু'টি- একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি বের হওয়ার জন্য। কিন্তু কুরাইশরা শুধু পূর্বদিকে একটি দরজা রাখে। তৃতীয়তঃ তারা সমতল ভুমি থেকে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে- যাতে সবাই সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে; বরং তারা যাকে অনুমতি দেবে সেই যেন প্রবেশ করতে পারে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বলেছিলেনঃ 'আমার ইচ্ছা হয়, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে ইব্রাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা'বা গৃহ ভেঙ্গে দিলে নও-মুসলিম অজ্ঞ লোকদের মনে ভুল বুঝাবুঝি দেখা দেয়ার আশংকার কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি।' [বুখারীঃ ৪৪৮৪, ১৫৮৩, মুসলিমঃ ১৩৩৩] এ কথাবার্তার কিছুদিন পরেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। কিন্তু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার ভাগ্নে আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন মক্কার উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি উপরোক্ত ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত করেন এবং কা'বা গৃহের নির্মাণ ইব্রাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেন। কিন্তু মক্কার উপর তার কর্তৃত্ব বেশী দিন টেকেনি। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ মক্কায় সৈন্যাভিযান করে তাকে শহীদ করে দেয়। সে কা'বা গৃহকে আবার ভেঙ্গে জাহেলিয়াত আমলে কুরাইশরা যেভাবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই নির্মাণ করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পর কোন কোন বাদশাহ্ উল্লেখিত হাদীস দৃষ্টে কা'বা গৃহকে ভেঙ্গে হাদীস অনুযায়ী নির্মাণ করার ইচ্ছা করে ইমাম মালেক

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ

৯৭. তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে(১), যেমন মাকামে ইব্‌রাহীম(২)। আর

ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে ফতোয়া চান। তিনি তখন ফতোয়া দেন যে, এভাবে কা'বা গৃহের ভাঙ্গা-গড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী বাদশাহ্‌দের জন্য একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কা'বা গৃহ তাদের হাতে একটি খেলনায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে, সে অবস্থায়ই থাকতে দেয়া উচিৎ। সমগ্র মুসলিম সমাজ তার এ ফতোয়া গ্রহণ করে নেয়। ফলে আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মাণই অবশিষ্ট রয়েছে। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখাটো কাজ সব সময়ই অব্যাহত থাকে। বর্তমান আমলে বেশ কয়েক বছর পূর্বে সাবেক খাদেমুল হারামাইন আশ্-শরীফাইন বাদশাহ্ ফাহদ ইবনে আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ্ সবচেয়ে ব্যয়বহুল এক সংস্কার কাজ করে কা'বা গৃহের সৌন্দর্য বহুগুণ বর্ধিত করেন।

(১) এ আয়াতে কা'বা গৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ এতে আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নিদর্শন রয়েছে, আর তা হচ্ছে মাকামে ইব্‌রাহীম। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হয়ে যায়; তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। তৃতীয়তঃ সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য এতে হজ্জ পালন করা ফরয; যদি এ গৃহ পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি ও সামর্থ্য থাকে। কা'বা গৃহ নির্মিত হওয়ার দিন থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ্ তা'আলা এর বরকতে শত্রুর আক্রমণ থেকে মক্কাবাসীদের নিরাপদে রেখেছেন। বাদশাহ্ আবরাহা বিরাট হস্তীবাহিনীসহ কা'বা গৃহের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। আল্লাহ্ স্বীয় কুদরতে পক্ষীকূলের মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। মক্কার হারামে প্রবেশকারী মানুষ, এমনকি জীবজন্তু পর্যন্ত বিপদমুক্ত হয়ে যায়।

(২) কা'বাগৃহের বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, মাকামে ইব্‌রাহীম। যা একটি বড় নিদর্শন হওয়ার কারণেই কুরআনে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মাকামে ইব্‌রাহীম একটি পাথরের নাম। এর উপরে দাঁড়িয়েই ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম কা'বা গৃহ নির্মাণ করতেন। এ পাথরের গায়ে ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালামের গভীর পদচিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান। একটি পাথরের উপর পদচিহ্ন পড়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র অপার কুদরতের নিদর্শন এবং এতে কা'বা গৃহের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়। এ পাথরটি কা'বা গৃহের নীচে দরজার নিকটে অবস্থিত ছিল। যখন কুরআনে মাকামে-ইবরাহীমে সালাত আদায় করার আদেশ নাযিল হয় তখন তওয়াফকারীদের সুবিধার্থে পাথরটি সেখান থেকে সরিয়ে কা'বা গৃহের সামনে সামান্য দূরে যমযম কূপের নিকট স্থাপন করা হয়। বর্তমানে মাকামে- ইব্‌রাহীমকে সরিয়ে নিয়ে একটি কাঁচ-পাত্রে সংরক্ষিত করে দেয়া হয়েছে। তাওয়াফ-পরবর্তী নামায এর আশে পাশে পড়া উত্তম। কিন্তু শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে মাকামে ইব্‌রাহীম সমগ্র মসজিদে হারামকেও বুঝায়। এ কারণেই ফিক্‌হবিদগণ বলেনঃ মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে তওয়াফ পরবর্তী সালাত পড়ে নিলেই তা আদায় হয়ে যাবে।

أٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ(১)। আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ(২) করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য(৩)। আর যে

(১) কা'বা গৃহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়। এ নিরাপত্তা মুলতঃ সৃষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবেই প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তরে কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নিহিত রেখেছেন। জাহেলিয়াত যুগের আরব ও তাদের বিভিন্ন গোত্র অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্বেও কা'বা গৃহের সম্মান রক্ষার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত ছিল না। হারামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা পিতার হত্যাকারীকে দেখেও কিছুই বলত না। মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হারামের অভ্যন্তরে কিছুক্ষণ যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কা'বা গৃহকে পবিত্র করা। বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন যে, এ অনুমতি কা'বা গৃহকে পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে কয়েক ঘন্টার জন্যেই ছিল। এরপর পূর্বের ন্যায় চিরকালের জন্যে কা'বার হারামে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেনঃ আমার পূর্বে কারো জন্যে হারামের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা হালাল ছিল না, আমার পরেও কারো জন্যে হালাল নয়। আমাকেও মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়েছিল, পরে আবার হারাম করে দেয়া হয়েছে। [বুখারীঃ ১৩৪৯; মুসলিমঃ ১৩৫৫]

তবে কাতাদা বলেন, হাসান বসরী বলেছেন, হারাম শরীফ কাউকে আল্লাহ্‌র সুনির্দিষ্ট হদ বা শাস্তি বাস্তবায়নে বাধা দেয় না। যদি কেউ হারামের বাইরে অন্যায় করে হারামে প্রবেশ করে তবে তার উপর হদ বা শাস্তি কায়েম করতে কোন বাধা নেই। যদি কেউ হারামে চুরি করে কিংবা ব্যভিচার করে বা হত্যা করে তার উপর শরী'আতের আইন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে [তাবারী]।

(২) হজ শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায় কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ, আরাফাত ও মুযদালেফায় অবস্থান ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মকে হজ বলা হয়। হজের বিস্তারিত নিয়ম-পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৌখিক উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

(৩) আয়াতে কা'বা গৃহের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির জন্য শর্তসাপেক্ষে কা'বা গৃহের হজ ফরয করেছেন। শর্ত এই যে, সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য থাকতে হবে। সামর্থ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে, যা দ্বারা সে কা'বা গৃহ পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়।

কেউ কুফরী করল সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন[১]।

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ٩٨

৯৮. বলুন, 'হে আহ্‌লে কিতাবগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের সাথে কেন কুফরী কর? আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সাক্ষী।'

এছাড়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। দৈহিক দিক দিয়ে হাত পা ও চক্ষু কর্মক্ষম হতে হবে। কারণ, যাদের এসব অঙ্গ বিকল, তাদের পক্ষে স্বীয় বাড়ী ঘরে চলাফেরাই দুস্কর। এমতাবস্থায় সেখানে যাওয়া ও হজের অনুষ্ঠানাদি পালন করা তার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হবে? মহিলাদের পক্ষে মাহ্‌রাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা শরীয়ত মতে নাজায়েয। কাজেই মহিলাদের সামর্থ্য তখনই হবে, যখন তার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ হজে থাকবে; নিজ খরচে করুক অথবা মহিলাই তার খরচ বহন করুক। এমনিভাবে কা'বা গৃহে পৌঁছার জন্যে রাস্তা নিরাপদ হওয়াও সামর্থ্যের একটি অংশ। যদি রাস্তা বিপজ্জনক হয় এবং জান-মালের ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা থাকে, তবে হজের সামর্থ্য নাই বলে মনে করা হবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আয়াতে সামর্থ বলতে, বান্দার শারীরিক সুস্থতা এবং নিজের উপর কোন প্রকার কমতি না করে পাথেয় ও বাহনের খরচ থাকা বুঝায়। [তাবারী]

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, আয়াতে কুফরী বলতে বোঝানো হয়েছে এমন ব্যক্তির কাজকে, যে হজ করাকে নেককাজ হিসেবে নিল না আর হজ ত্যাগ করাকে গোনাহের কাজ মনে করল না। [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, কুফরী করার অর্থ, আল্লাহ্ ও আখেরাতকে অস্বীকার করল। [তাবারী] মোটকথা: বান্দা বড়-ছোট যে ধরনের কুফরীই করুক না কেন তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ তার মুখাপেক্ষী নয়। এ আয়াতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সৃষ্টির কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নয়। যদি সমস্ত লোকই কাফের হয়ে যায় তবুও এতে তার রাজত্বে সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেমন, "তোমরা এবং পৃথিবীর সবাই যদি অকৃতজ্ঞ হও তারপরও আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ও প্রশংসার যোগ্য।" [সূরা ইবরাহীম:৮] আরও বলেন, "অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল। আল্লাহ্‌ও (তাদের ঈমানের ব্যাপারে) ভ্রুক্ষেপহীন হলেন; আর আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।" [সূরা আত-তাগাবুন:৬] সুতরাং তাঁর বান্দাদেরকে আনুগত্য করা এবং অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ বান্দাদের উপকারার্থেই দিয়ে থাকেন। এ জন্যে দেন না যে, বান্দার আনুগত্য বা অবাধ্যতা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি বা উপকার করবে। [আদওয়াউল বায়ান]

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾

৯৯. বলুন, 'হে আহ্‌লে কিতাবগণ! যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে তাকে কেন আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিচ্ছ, তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে? অথচ তোমরা সাক্ষী(১)। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অনবহিত নন।'

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾

১০০. হে মুমিনগণ! যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফের বানিয়ে ছাড়বে(২)।

(১) কাতাদা বলেন, আয়াতের অর্থ, হে আহলে কিতাব সম্প্রদায়! তোমরা কেন যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে, তাদেরকে ইসলাম ও আল্লাহ্‌র নবী থেকে বাধা দিচ্ছ? অথচ তোমরা তোমাদের কাছে সংরক্ষিত আল্লাহ্‌র কিতাবে যা পড় তার কারণে একথার সাক্ষ্য দিতে বাধ্য যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল এবং ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন, যা ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। তোমাদের কাছে সংরক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে তোমরা সেটা দেখতে পাও। [তাবারী]

(২) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে সাবধান করছেন যে, তারা যেন আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও নাসারাদের আনুগত্য না করে। কেননা তারা মুমিনদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যে নবী ও কিতাবের নেয়ামত প্রদান করেছেন সেটার হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে। কারণ তাদের অনুসরণ করলে তারা মুমিনদেরকে কাফের বানিয়ে ছাড়বে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা সেটা ঘোষণা করেছেন। যেমন, "কিতাবীদের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর কাফেররূপে ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে বিদ্বেষবশতঃ (তারা এটা করে থাকে)।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১০৯]। কাতাদা বলেন, আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ইয়াহূদী-নাসারাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন যেমনটি তোমরা শুনলে, তোমাদেরকে তাদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কেও সাবধান করেছেন, সুতরাং তোমরা কোনভাবেই তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে নিরাপদ ভেবো না। আর তোমাদের জানের ব্যাপারেও কল্যাণকামী মনে করো না। প্রকৃতপক্ষেই তারা পথ ভ্রষ্ট হিংসুটে শত্রু। কিভাবে তোমরা এমন এক সম্প্রদায়কে নিরাপদ মনে করতে পার যারা তাদের কিতাবের সাথে কুফরী করেছে, রাসূলদের হত্যা করেছে, দ্বীনের ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে এবং নিজেরা অপারগ হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র শপথ, এরা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাস্য ও শত্রু। [তাবারী]

وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝١٠١

১০১. আর কিভাবে তোমরা কুফরী করবে অথচ আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে তিলাওয়াত করা হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল রয়েছেন(১)? আর কেউ আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে সে অবশ্যই সরল পথের হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।

এগারতম রুকূ'

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝١٠٢

১০২. হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর(২)

(১) অর্থাৎ তোমাদের দ্বারা কুফরী হওয়া এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? তোমাদের কাছে তো আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ দিন-রাত্রি নাযিল হচ্ছেই। তাছাড়া তোমাদের সাথে আছেন আল্লাহ্‌র নবী যিনি সেটা তোমাদেরকে তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছেন এবং তোমাদের কাছে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। এমতাবস্থায় তোমাদের পক্ষ থেকে কুফরী হওয়া আশ্চর্যজনক নয় কি? অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাটি বলেছেন, "আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য ডাকছেন এবং আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে অংগীকার গ্রহণ করেছেন" [সূরা আল-হাদীদ:৮] কাতাদা বলেন, কুফরী না করার পক্ষে দু'টি বড় নিদর্শন রয়েছে। একটি আল্লাহ্‌র নবী অপরটি আল্লাহ্‌র কিতাব। তন্মধ্যে আল্লাহ্‌র নবী চলে গেছেন কিন্তু তাঁর কিতাব অবশিষ্ট রয়েছে। যাতে রয়েছে আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ হিসেবে হালাল-হারাম, আনুগত্য ও অবাধ্যতার বিষয়ে যাবতীয় বিধি-বিধান। [ইবনে আবী হাতেম] কোন কোন বর্ণনায় এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আউস ও খাযরাজ গোত্রে অন্ধকার যুগে যে সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল কোন এক মজলিসে তারা সেটা স্মরণ করে পরস্পর মারমুখী হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অর্জনের হক্ক আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাকওয়ার ঐ স্তর অর্জন কর, যা তাকওয়ার হক। কিন্তু তাকওয়ার হক বা যথার্থ তাকওয়া কি? আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ, রবী, কাতাদাহ্ ও হাসান রাহিমাহুমুল্লাহ্ বলেন, তাকওয়ার হক হল, প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা, আল্লাহ্‌কে সর্বদা স্মরণে রাখা- কখনো বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা- অকৃতজ্ঞ না হওয়া। [ইবন কাসীর]

এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না[১]।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۚ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. আর তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রশি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিগর্তের দ্বারপ্রান্তে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা হেদায়াত পেতে পার।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ

(১) এতে বুঝা যায় যে, পূর্ণ ইসলামই প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার নামই হচ্ছে তাকওয়া অবলম্বন। আয়াতের শেষে মুসলিম না হয়ে যেন কারও মৃত্যু না হয় সেটার উপর জোর দেয়া হয়েছে। দুনিয়াতে ঈমানদারের অবস্থান হবে আশা-নিরাশার মধ্যে। সে একদিকে আল্লাহ্‌র রহমতের কথা স্মরণ করে নাজাতের আশা করবে, অপরদিকে আল্লাহ্‌র শাস্তির কথা স্মরণ করে জাহান্নামে যাওয়ার ভয় করবে। কিন্তু মৃত্যুর সময় তাকে আল্লাহ্ সম্পর্কে সুধারণা নিয়েই মরতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ্ সম্পর্কে সু ধারণা না নিয়ে মারা না যায়।" [মুসলিম: ২৮৭৭] অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তার আশা থাকবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করবেন।

করবে[১]; আর তারাই সফলকাম।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

১০৫. তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে[২] ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

(১) ইসলাম যেসব সৎকর্ম ও পূণ্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে যে সব সৎকর্মের প্রচলন করেছেন, তা সবই আয়াতের উল্লেখিত 'মারূফ' তথা সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। 'মারূফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিচিত। এসব সৎকর্ম সাধারণ্যে পরিচিত। তাই এগুলোকে 'মারূফ' বলা হয়। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব অসৎকর্মরূপী কাজকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন বলে খ্যাত, তা সবই আয়াতে উল্লেখিত 'মুনকার' এর অন্তর্ভুক্ত। এ স্থলে 'ওয়াজিবাত' অর্থাৎ 'জরুরী করণীয় কাজ' ও 'মা'আসী' অর্থাৎ 'গোনাহর কাজ' -এর পরিবর্তে 'মারূফ' ও 'মুনকার' বলার রহস্য সম্ভবত এই যে, নিষেধ ও বাধাদানের নির্দেশটি শুধু সবার কাছে পরিচিত ও সর্বসম্মত মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন খারাপ কাজ দেখবে, সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে, তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে, আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। এটাই ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর।' অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'এর পরে সরিষা পরিমাণ ঈমানও বাকী নেই।' [মুসলিমঃ ৪৯, আবু দাউদঃ ১১৪০] অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। নতুবা অচিরেই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযিল করবেন। তারপর তোমরা অবশ্যই তাঁর কাছে দো'আ করবে, কিন্তু তোমাদের দো'আ কবুল করা হবে না।' [তিরমিযীঃ ২১৬৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৯১] অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক লোক জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, কোন লোক সবচেয়ে বেশী ভাল? তিনি বললেনঃ সবচেয়ে ভাল লোক হল যে আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করে, সৎকাজে আদেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখে।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৪৩১]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'দুই কিতাবী সম্প্রদায় তাদের দ্বীনের মধ্যে বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে। আর এ উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। প্রত্যেক দলই জাহান্নামে যাবে কেবলমাত্র একটি দল ব্যতীত। আর তারা হল আল-জামা'আতের অনুসারী। আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু দল বেরুবে যাদেরকে কুপ্রবৃত্তি এমনভাবে তাড়িয়ে বেড়াবে, যেমন পাগলা কুকুরে কামড়ানো ব্যক্তিকে সর্বদা কুকুর তাড়িয়ে বেড়ায়।' [আবু দাউদঃ ৪৫৯৭, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১০২]

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. সেদিন কিছু মুখ উজ্জল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে(১); যাদের মুখ কালো হবে (তাদেরকে বলা হবে), 'তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে(২)? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে।'

(১) উজ্জ্বল মুখ ও কালো মুখ কারা, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। ইবনে-আব্বাস বলেনঃ আহলে সুন্নাত সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে এবং বিদ'আতীদের মুখমণ্ডল কালো হবে। আতা বলেনঃ মুহাজির ও আনসারগণের মুখমণ্ডল সাদা হবে এবং বণী-নদ্বীরের মুখমণ্ডল কালো হবে। ইকরিমাহ বলেনঃ আহলে কিতাবগণের এক অংশের মুখমণ্ডল কালো হবে অর্থাৎ যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত লাভের পূর্বে তিনি নবী হবেন বলে বিশ্বাস করতো কিন্তু নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করার পরিবর্তে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করে। আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'খারেজী সম্প্রদায়ের মুখমণ্ডল কালো হবে। আর যারা তাদের হত্যা করবে, তাদের মুখমণ্ডল সাদা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'এটি যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাতবার না শুনতাম, তবে বর্ণনাই করতাম না' [তিরমিযীঃ ৩০০০]

(২) তাদের চেহারা কেন কালো হবে, তার কারণ বর্ণনায় এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের চেহারা কালো হবার কারণ হচ্ছে, "তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে"। অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যাচার করাকেই চেহারা কালো হওয়ার কারণ বলা হয়েছে, "আর যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, আপনি কিয়ামতের দিন তাদের চেহারাসমূহ কালো দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?" [সূরা আয-যুমারঃ ৬০] আবার কোন কোন আয়াতে গোনাহ অর্জন করার কারণে তাদের চেহারা কালো হবে বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। "আর যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে ; আল্লাহ্ থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ নেই ; তাদের মুখমন্ডল যেন রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত। তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"[সূরা ইউনুসঃ২৭] কোন কোন আয়াতে কুফরী ও অপরাধী হওয়াকেই চেহারা কালো হবার কারণ হিসেবে ধরা হয়েছে, "আর অনেক চেহারা সেদিন হবে ধূলিধূসর, সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা। এরাই কাফির ও পাপাচারী।" [সূরা আবাসাঃ ৪০-৪১]। বস্তুতঃ এগুলোতে কোন বিরোধ নেই। কারণ, এ সব কারণেই চেহারা কালো হবে। কাফেরদের চেহারা কালো হবেই।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

১০৭. আর যাদের মুখ উজ্জল হবে তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে থাকবে(১), সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

১০৮. এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমরা আপনার কাছে যথাযথভাবে তেলাওয়াত করছি। আর আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতের প্রতি যুলুম করতে চান না।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

১০৯. আর আসমানে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌র কাছেই সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে।

বারতম রুকূ'

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ

১১০. তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত(২), মানব জাতির

(১) শুভ্র মুখমণ্ডলবিশিষ্টদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র অনুকম্পার মধ্যে অবস্থান করবে। ইবনে-আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ এখানে আল্লাহ্‌র অনুকম্পা বলে জান্নাত বুঝানো হয়েছে। তবে জান্নাতকে অনুকম্পা বলার রহস্য এই যে, মানুষ যত ইবাদাতই করুক না কেন, আল্লাহ্‌র অনুকম্পা ব্যতীত জান্নাতে যেতে পারবে না। কারণ, ইবাদাত করা মানুষের নিজস্ব পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহ্‌র প্রদত্ত সামর্থের বলেই মানুষ ইবাদাত করতে পারে। সুতরাং ইবাদাত করলেই জান্নাতে প্রবেশ অপরিহার্য হয়ে যায় না। বরং আল্লাহ্‌র অনুকম্পার দ্বারাই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব।

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা সত্তরটি জাতিকে পূর্ণ করবে, তন্মধ্যে তোমরাই হলে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। [তিরমিযীঃ ৩০০১, ৪২৮৭] (অর্থাৎ তোমাদের পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, যাদের সংখ্যা সত্তরটি। এর দ্বারা সংখ্যা বা আধিক্য বোঝানো উদ্দেশ্য। মানাওয়ী, ফায়দুল কাদীর) অপর হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'জান্নাতীদের কাতার হবে একশ' বিশটি। তন্মধ্যে আশিটি কাতার হবে এই উম্মতের।' [তিরমিযীঃ ২৫৪৬, ইবনে মাজাহ্ঃ ৪২৮৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৫৫] অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, এ উম্মত হবে জান্নাতীদের অর্ধেক। [বুখারীঃ ৬৫২৮, মুসলিমঃ ২২১] আরেক হাদীসে এসেছে, এ উম্মত সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' [মুসলিমঃ ৮৫৫, ইবনে মাজাহ্ঃ ১০৮৩]

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿١١٠﴾

জন্য যাদের বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে(১) এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে(২)। আর আহ্‌লে কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো তবে তা ছিল তাদের জন্য ভাল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফাসেক।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ۗ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۗ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. সামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে

(১) মুসলিম উম্মতকে 'শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়' বলে ঘোষনা করার কারণসমূহ কুরআনুল কারীম একাধিক আয়াতে বর্ণনা করেছে। আলোচ্য ১১০ নং আয়াতে মুসলিম উম্মতের শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা মানব জাতির উপকারার্থে সমুত্থিত হয়েছে। আর তাদের প্রধান উপকার এই যে, মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের চেষ্টাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে 'সৎকাজে আদেশ দান এবং অসৎকাজে নিষেধ' করার দায়িত্ব অধিকতর পুর্ণত্বলাভ করেছে। পুর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ব্যাপক ঔদাসীন্যের দরুন দ্বীনের অন্যান্য বিশেষ কার্যাবলীর ন্যায় সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করার কর্তব্যটিও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ উম্মতের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকবে- যারা 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ'- এর কর্তব্য পুরোপুরি পালন করে যাবে। আবুল আলিয়া বলেন, এ উম্মতের চেয়ে বেশী কোন উম্মত ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেয়নি, ফলে তাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। [ইবন আবী হাতেম] আয়াতে এ উম্মতকে শ্রেষ্ঠ বলার সাথে সাথে তাদের কর্ম কেমন হওয়া উচিত তা বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মা'রূফ বা সৎকাজ হচ্ছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষী দেয়া, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সেগুলোর স্বীকৃতি দেয়া এবং তার উপর কাফের মুশরিকদের সাথে জিহাদে থাকা। আর সবচেয়ে বড় মা'রূফ বা সৎকাজ হচ্ছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র স্বীকৃতি আদায় করা। পক্ষান্তরে সবচেয়ে বড় মুনকার বা অসৎকাজ হচ্ছে, মিথ্যারোপ করা। [তাবারী]

(২) এ বাক্যাংশে মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় তাদের ঈমানের বিশেষ স্বাতন্ত্র থাকার কারণে বিশেষকরে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

যুদ্ধ করে তবে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে; তারপর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

১১২. আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে যেখানেই তাদেরকে পাওয়া গেছে সেখানেই তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। আর তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং তাদের উপর দারিদ্র নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করত এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করত; তা এ জন্যে যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালংঘন করত।

لَيْسُوا۟ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَٰتِ اللَّهِ ءَانَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

১১৩. তারা সবাই একরকম নয়। কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত এক দল আছে; তারা রাতে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে এবং তারা সিজ্‌দা করে(১)।

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার সালাত অনেক দেরী করে আদায় করলেন, তারপর মসজিদের দিকে বের হয়ে দেখতে পেলেন যে, লোকেরা সালাতের অপেক্ষা করছে। তখন তিনি বললেনঃ কোন দ্বীনের কেউই তোমাদের মত এ সময়ে সালাত আদায় করে না। ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হল। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৯৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন আবদুল্লাহ ইবন সালাম, সা‘লাবাহ ইবন সা‘ইয়াহ, উসাইদ ইবন সা‘ইয়াহ ও আসাদ ইবন উবাইদ সহ একদল ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনল, তখন ইয়াহূদী নেতারা বলতে লাগল, মুহাম্মাদের উপর যারা ঈমান এনেছে তারা হচ্ছে আমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট লোক। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ ইয়াহূদী-নাসারা সবাই যে ক্ষতিগ্রস্ত তা কিন্তু নয়। তাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে মুক্তি পাবে।

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۖ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪. তারা আল্লাহ্ এবং শেষ দিনে ঈমান আনে, সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎকাজে নিষেধ করে এবং তারা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে(১)। আর তারাই পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত।

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

১১৫. আর উত্তম কাজের যা কিছু তারা করে তা থেকে তাদেরকে কখনো বঞ্চিত করা হবে না। আর আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾

১১৬. নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র কাছে কখনো কোন কাজে আসবে না। আর তারাই অগ্নিবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

(১) এ আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও নাসারা সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদের কিছু গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমত: তারা হক্কের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, কোন কিছুই তাদেরকে হক্ক পথ থেকে টলাতে পারে না। দ্বিতীয়ত: তারা রাতের বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে। তৃতীয়ত: তারা সালাত আদায় করে। চতুর্থত: তারা আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ঈমান রাখে, পঞ্চমত: তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, ষষ্টত: তারা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্কদৃষ্টে মনে হয়, যখন আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মাতে মুহাম্মদীকে সবচেয়ে উত্তম উম্মত হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তার কারণ হিসেবে ঈমান ও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার গুণ তাদের জন্য সাব্যস্ত করেছেন, তখন এ গুণগুলো অন্যান্য উম্মত বিশেষ করে আহলে কিতাবদের যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে, তাদেরকেও উত্তম উম্মতের অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানে এ ঈমানদার আহলে কিতাবদের আরও কিছু গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে, "আর যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তাদের মধ্যে যারা যথাযথভাবে তা তিলাওয়াত করে, তারা তাতে ঈমান আনে।" [সূরা আল-বাকারাহ:১২১] আবার কোথাও বলা হয়েছে, "আর কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ্র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তাঁর প্রতি এবং তিনি যা তোমাদের ও তাদের প্রতি নাযিল করেছেন তাতে অবশ্যই ঈমান আনে এবং আল্লাহ্র আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে না।" [সূরা আলে-ইমরান: ১৯৯]

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۱۷﴾

১১৭. এ পার্থিব জীবনে যা তারা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ূ, যা আঘাত করে ঐ জাতির শস্যক্ষেতে, যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে; অতঃপর তা ধ্বংস করে দেয়। আর আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন যুলুম করেননি, তারাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৮. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না(১)। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না; যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তা-ই তারা

(১) অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ মিত্ররূপে গ্রহণ করো না। بطانة শব্দের অর্থ অভিভাবক, বন্ধু, বিশ্বস্ত, রহস্যবিদ। কাপড়ের অভ্যন্তর ভাগকেও بطانة বলা হয়, যা শরীরের সাথে মিশে থাকে। 'কোন ব্যক্তির অভিভাবক, বিশ্বস্ত বন্ধু এবং যার সাথে পরামর্শ করে কাজ করা হয়, এরূপ ব্যক্তিকে তার بطانة বলা হয়।' এখানে بطانة বলে বন্ধু, বিশ্বস্ত, গোপন তথ্যের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য লোককে বোঝানো হয়েছে। অতএব আলোচ্য আয়াতে মুসলিমদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, নিজেদের দ্বীনের লোকদের ছাড়া অন্য কাউকে মুরুব্বী ও উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করে তাদের কাছে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশ করতে যেও না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যখনই কোন নবী পাঠিয়েছেন বা কোন খলীফা বা রাষ্ট্রনায়ককে ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তখনই তার দু'ধরনের মিত্রের সমাহার ঘটে। এক ধরনের মিত্র তাকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং সেটার উপর উৎসাহ যোগায়। অপর ধরনের মিত্র তাকে খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সেটার উপর উদ্দীপনা দিতে থাকে। আল্লাহ্ যাকে হেফাযত করতে ইচ্ছা করেন তিনি ব্যতীত সে মিত্রের অকল্যাণ থেকে বাঁচার কোন পথ থাকে না।" [বুখারী: ৭১৯৮] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, অন্ধকার যুগে কোন কোন মুসলিমের সাথে কোন কোন ইয়াহূদীর সন্ধিচুক্তি ছিল। সে চুক্তির কারণে ইসলাম গ্রহণের পরও মুসলিমরা তাদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বজায় রাখত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে ইয়াহূদী-নাসারা তথা অমুসলিমদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার জন্য নির্দেশ দেন। [ইবন আবী হাতেম, আত-তাফসীরুস সহীহ]

কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরো গুরুতর(১)। তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর(২)।

(১) অর্থাৎ তারা তোমাদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে কসুর করবে না। তারা তোমাদের বিপদ কামনা করে। এ ধরনের কিছু বিষয় স্বয়ং তাদের মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যে শত্রুতা গোপন রাখে, তা আরও মারাত্মক। আমি তোমাদেরকে সামনে সব আলামত প্রকাশ করে দিয়েছি; এখন তোমরা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পার তবে তা থেকে উপকার পেতে পার।

উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াহূদী হোক কিংবা নাসারা, কপট বিশ্বাসী মুনাফেক হোক কিংবা মুশরেক- কেউ তোমাদের সত্যিকার হিতাকাঙ্খী নয়। তারা সর্বদাই তোমাদের বোকা বানিয়ে তোমাদের ক্ষতি সাধনে ব্যাপৃত এবং ধর্মীয় ও পার্থিব অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে। তোমরা কষ্টে থাক এবং কোন না কোন উপায়ে তোমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতি হোক, এটাই হলো তাদের কাম্য। তাদের অন্তরে যে শত্রুতা লুক্কায়িত রয়েছে, তা খুবই মারাত্মক। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্দমনীয় জিঘাংসায় উত্তেজিত হয়ে এমন সব কথাবার্তা বলে ফেলে, যা তাদের গভীর শত্রুতার পরিচায়ক। শত্রুতা ও প্রতিহিংসায় তাদের মুখ থেকে অসংলগ্ন কথা বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এহেন শত্রুদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা শত্রু-মিত্রের পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের বিধান বলে দিয়েছেন, সুতরাং মুসলিমদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া খুবই সমীচীন।

(২) ইসলাম বিশ্বব্যাপী করুণার ছায়াতলে মুসলিমগণকে অমুসলিমদের সাথে সহানুভুতি, শুভেচ্ছা, মানবতা ও উদারতার অসাধারণ নির্দেশ দিয়েছে। এটা শুধু মৌখিক নির্দেশই নয়; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ একে কার্যে পরিণত করেও দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু মুসলিমদের নিজস্ব রাষ্ট্র ও তার বৈশিষ্ট্যপুর্ণ কার্যাবলী সংরক্ষণের স্বার্থে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, ইসলামী আইনে অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক একটি বিশেষ সীমার বাইরে এগিয়ে নেয়ার অনুমতি মুসলিমদের দেয়া যায় না। কারণ, এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুক্তিপুর্ণ, সঙ্গত ও জরুরী ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই হেফাজত হয়। যে সব অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দা কিংবা মুসলিমদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষনের জন্যে জোরদার নির্দেশাবলী ইসলামী আইনের গুরুত্বপুর্ণ অংশ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

هَآأَنتُمْ أُولَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ ۖ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

১১৯. দেখ, তোমরাই তাদেরকে ভালবাস কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না অথচ তোমরা সব কিতাবে ঈমান রাখ। আর তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি; কিন্তু তারা যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দাঁত দিয়ে কাটতে থাকে।' বলুন, 'তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর।' নিশ্চয় অন্তরে যা রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত।

ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'সাবধান! যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রতি অত্যাচার করে কিংবা তার প্রাপ্য হ্রাস করে কিংবা তার উপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করে, তবে কেয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ থেকে উকিল হবো।' [আবু দাউদঃ ৩০৫২]

কিন্তু এসব উদারতার সাথে সাথে মুসলিমদের নিজস্ব সত্তার হেফাযতের স্বার্থে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা বিশ্বস্ত মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করো না। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলা হলো যে, এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক রয়েছে। আপনি তাকে ব্যক্তিগত মুনশী হিসাবে গ্রহণ করে নিলে ভালই হবে। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উত্তরে বলেনঃ এরূপ করলে মুসলিমদের ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করা হবে, যা কুরআনে নির্দেশের পরিপন্থী।' [ইবন আবী হাতেম; আত-তাফসীরুস সহীহ] ইমাম কুরতুবী হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ও তফসীরবিদ। তিনি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে মুসলিমদের মধ্যে এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরন ও তার অশুভ পরিণাম এভাবে বর্ণনা করেনঃ "আজকাল অবস্থা এমন পাল্টে গেছে যে, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্যরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এভাবে ওরা মুর্খ বিত্তশালী ও শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসেছে।" আধুনিক সভ্যতার যুগেও বিশেষ মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী নয়- এমন কোন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা ও মুরুব্বীরূপে গ্রহণ করা হয় না। তাই মুসলিম শাসকগণেরও এ ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত।

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

১২০. তোমাদের মঙ্গল হলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয় আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা তাতে আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না[১]। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

তেরতম রুকূ'

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

১২১. আর স্মরণ করুন, যখন আপনি আপনার পরিজনদের নিকট থেকে প্রত্যূষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য মুমিনগণকে ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করছিলেন; আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

১২২. যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল অথচ আল্লাহ্ উভয়ের অভিভাবক

(১) অর্থাৎ তাদের কাফেরসুলভ মনোভাবের আরো প্রমাণ হলো, তাদের অবস্থা এই যে, তোমরা কোন সুখকর অবস্থার সম্মুখীন হলে তারা দুঃখিত হয়, আর তোমরা কোন বিপদে পতিত হলে তারা আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠে। অতঃপর আয়াতে এ ধরনের লোকদের চক্রান্ত এবং শত্রুতার অশুভ পরিণাম থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে একটি সহজ সুন্দর ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হচ্ছেঃ "তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করলে ওদের চক্রান্ত তোমাদের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট করতে পারবে না"। কাতাদা বলেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যখন তারা মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব ও ঐক্যবদ্ধতা দেখে এবং শত্রুদের উপর মুসলিমদের বিজয় প্রত্যক্ষ করে, তখন তারা কষ্ট পায়। আর যখন মুসলিমদের মধ্যে দলাদলি ও মতবিরোধ হয়েছে দেখতে পায়, অথবা মুসলিমদের কোন পরাজয় লক্ষ্য করে, তখনি তারা খুশীতে আত্মহারা হয়ে পড়ে। যখনি তাদের এ ধরনের লোকের আবির্ভাব হবে, তখনি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গোপন অবস্থা প্রকাশ করে দিবেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা চলতে থাকবে। [তাবারী]

ছিলেন(১), আর আল্লাহ্‌র উপরই যেন মুমিনগণ নির্ভর করে(২)।

(১) অর্থাৎ তোমাদের দুটি দল ভীরুতা প্রকাশের সংকল্প করেছিল, অথচ আল্লাহ্ তাদের সহায় ছিলেন। এ দুই দল হলো আউস গোত্রের বনী হারেসা এবং খাযরাজ গোত্রের বনী সালমা। এরা উভয়ই আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের দেখাদেখি দুর্বলতা প্রদর্শন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা ছিল না, বরং স্বদলের সংখ্যাল্পতা ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই তারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। তবে আয়াতের منكم বাক্যটি তাদের ঈমানের পূর্ণাঙ্গতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ গোত্রদ্বয়ের মধ্য থেকে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ বলতেন, 'এ আয়াত যদিও আমাদের বনু হারেসা ও বনু সালামাকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছিল এবং আয়াতে আমাদের প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ ব্যাক্যাংশের সুসংবাদও আমাদের লক্ষ্য করেই উক্ত হয়েছে। এ কারণে এ আয়াত নাযিল না হওয়া আমাদের জন্য সুখকর ছিল না।' [বুখারীঃ ৪০৫১, ৪৫৫৮, মুসলিমঃ ২৫০৫]

(২) আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করাই মুসলিমদের কর্তব্য। এতে পরিস্কার বলা হয়েছে যে, সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার পর ভরসা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের উপরই করা দরকার। সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই বনী-হারেসা ও বনী সালমার মনে দুর্বলতা ও ভীরুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা দ্বারা এর প্রতিকার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র প্রতি যথার্থ ভরসা ও আস্থাই এ জাতীয় কুমন্ত্রণার অমোঘ প্রতিকার। মূলতঃ 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ভরসা) মানুষের প্রতি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। ইয়াদ ইবন গানম আল-আশ'আরী বলেন, ইয়ারমূকের যুদ্ধে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরপর পাঁচজনকে আমীর বানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যুদ্ধ শুরু হলে একমাত্র আমীর হবে আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ। যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধের ময়দান থেকে আমরা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লিখলাম: মৃত্যু আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। আমাদের জন্য সাহায্য পাঠান। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটার উত্তরে লিখলেন, সাহায্য চেয়ে পাঠানো পত্র আমার হস্তগত হয়েছে। আমি তোমাদেরকে এমন একজনের সন্ধান দেব যিনি সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারেন, যাঁর সেনাবাহিনী সদা প্রস্তুত, তিনি হচ্ছেন, আল্লাহ্ তা'আলা। সুতরাং তোমরা তার কাছেই সাহায্য চাও। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের দিনে তোমাদের চেয়ে কম সংখ্যা ও অস্ত্র-সস্ত্র নিয়েও কাফেরদের উপর জয়লাভ করেছিলেন। অতএব, যখন আমার এ চিঠি আসবে তখন তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, এ ব্যাপারে আর আমার সাথে যোগাযোগ করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা যুদ্ধ করলাম এবং যুদ্ধে জয়লাভ করলাম। [মুসনাদে আহমাদ ১/৪৯; সহীহ ইবন হিব্বান: ১১/৮৩-৮৪]

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. আর(১) বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন অথচ তোমরা হীনবল ছিলে। কাজেই তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. স্মরণ করুন, যখন আপনি মুমিনগণকে বলছিলেন, 'এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব তিন হাজার ফিরিশ্তা নাযিল করে তোমাদেরকে সহযোগিতা করবেন?(২)'

(১) এখানে ঐ যুদ্ধের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হচ্ছে- যাতে মুসলিমরা পুরোপুরি তাওয়াক্কুলের পরিচয় দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাফল্য দান করেছিলেন। অর্থাৎ স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তা'আলা বদরে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন; অথচ তোমরা সংখ্যায় ছিলে অতি নগণ্য। আর সে যুদ্ধটি ছিল বদরের যুদ্ধ।

(২) এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের প্রভূত শক্তি দান করেছেন। একজন ফেরেশতা একাই গোটা জনপদ উল্টে দিতে পারেন। উদাহারণতঃ কওমে-লুতের বস্তি একা জিবরাঈল 'আলাইহিস্ সালামই উল্টে দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় এখানে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন ছিল? এছাড়া ফেরেশতারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণই করেছিল, তখন একটি কাফেরেরও প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল না। এ সব প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। অর্থাৎ ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য তাদের দ্বারা যুদ্ধ জয় করানো ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীকে সান্ত্বনা প্রদান করা, তাদের মনোবল দৃঢ় করা এবং বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া। এ ঘটনা সম্পর্কেই সূরা আল-আনফালের ১২ নং আয়াতে আরও স্পষ্ট করে ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, 'তোমরা মুসলিমদের অন্তর স্থির রাখ- অস্থির হতে দিয়ো না।' অন্তর স্থির রাখার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, কোন না কোন উপায়ে মুসলিমদের সামনে একথা ফুটিয়ে তোলা যে, আল্লাহ্র ফেরেশতারা তাদের সাহায্যার্থে দাড়িয়ে রয়েছেন। যেমন কখনো দৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে, কখনো আওয়াজ দিয়ে এবং কখনো অন্য কোন উপায়ে। বদরের রণক্ষেত্রে এসব উপায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন সাহাবী জিবরাঈলের আওয়াজ শুনেছেন যে, তিনি কাউকে ডাকছেন। কেউ কেউ কতক ফেরেশতাকে দেখেছেনও। কোন কোন সাহাবী কোন কোন কাফেরকে ফেরেশতাদের

بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. হ্যাঁ, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তারা দ্রুত গতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তবে আল্লাহ্ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফিরিশ্‌তা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন(১)।

হাতে মরতেও দেখেছেন [দেখুন, মুসলিম: ১৭৬৩]

উপরোক্ত ঘটনাবলী এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে ফেরেশতাগণ মুসলিমদের আশ্বস্ত করছিলেন যে, তারাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাজ ছিল মুসলিমদের মনোবল অটুট রাখা এবং সান্ত্বনা দেয়া। পুরো যুদ্ধটাই ফেরেশতাদের দ্বারা করানো উদ্দেশ্য ছিল না। এর আরও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, এ জগতে জিহাদের দায়িত্ব মানুষের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। সে কারণেই তারা সওয়াব, ফযীলত ও উচ্চমর্যাদা লাভ করে। ফেরেশতা-বাহিনী দ্বারা দেশ জয় করা যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হতো, তাহলে পৃথিবীতে কাফেরদের রাষ্ট্র দুরের কথা, তাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেত না। এ বিশ্ব চরাচরে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা তা নয়। এখানে কুফর, ঈমান, ইবাদাত ও গোনাহ মিশ্রিতভাবেই চলতে থাকবে। এদের পরিস্কার পৃথকীকরনের জন্যে হাশরের দিন নির্ধারিত রয়েছে। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সংখ্যা বিভিন্ন সূরায় বিভিন্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল-আনফালের আয়াতে এক হাজার, সূরা আলে-ইমরানের আয়াতে প্রথমে তিন হাজার এবং পরে পাঁচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয়েছে। এর রহস্য কি? উত্তর এই যে, সূরা আল-আনফালে বলা হয়েছে, বদর যুদ্ধে মুসলিমগণ- যাদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের জন আর শত্রু সংখ্যা এক হাজার- আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এতে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করার ওয়াদা করা হয়। অর্থাৎ শত্রু সংখ্যা যত, তত সংখ্যক ফেরেশতা প্রেরণ করা হবে। আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন তোমরা স্বীয় রব এর সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের জবাব দেন যে, আমি এক হাজার অনুসরণকারী ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবো'। এ আয়াতের পরও ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে মুসলিমদের মনোবল অটুট রাখা এবং বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা। পরবর্তীতে সূরা আলে ইমরানের আলোচ্য আয়াতে তিন হাজার ফেরেশতার ওয়াদা করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বদরের মুসলিমদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, কুরয ইবনে জাবের মুহারেবী স্বীয় গোত্রের বাহিনী নিয়ে কুরাইশদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসছে। পূর্বেই শত্রুদের সংখ্যা মুসলিমদের তিনগুণ বেশী ছিল। এ সংবাদে মুসলিমদের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিলে তিন

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ؕ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝١٢٦

১২৬. আর এটা তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য শুধু সুসংবাদ ও তোমাদের আত্মিক প্রশান্তির জন্য করেছেন। আর সাহায্য তো শুধু পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র কাছ থেকেই হয়।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ۝١٢٧

১২৭. যাতে তিনি কাফেরদের এক অংশকে ধ্বংস করেন বা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন(১); ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝١٢٨

১২৮. তিনি তাদের তাওবা কবুল করবেন বা তাদেরকে শাস্তি দেবেন- এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই; কারণ

হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয়- যাতে শত্রুদের চাইতে মুসলিমদের সংখ্যা তিনগুন বেশী হয়ে যায়। অতঃপর এ আয়াতের শেষ ভাগে কয়েকটি শর্ত যোগ করে এ সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে পাঁচ হাজার করে দেয়া হয়েছে। শর্ত ছিল দু'টিঃ (এক) মুসলিমগণ ধৈর্য ও আল্লাহ্ভীতির উচ্চস্তরে পৌছলে, (দুই) শত্রুরা আকস্মিক আক্রমন চালালে। দ্বিতীয় শর্তটি অর্থাৎ আকস্মিক আক্রমণ বাস্তবে ঘটেনি, তাই পাঁচ হাজারের ওয়াদা পূরণেরও প্রয়োজন হয়নি। আকস্মিক আক্রমন না হওয়া সত্বেও আল্লাহ্র ওয়াদা পাঁচ হাজারের আকারে পূর্ণ করা হয়েছে, না তিন হাজারের আকারে সে সম্পর্কে তাফসীর ও ইতিহাসবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। [তাফসীরে ফাতহুল কাদীর]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে বলেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সাহায্য করবেন দু'টি কারণের কোন একটি কারণে। এক. তিনি হত্যা, বন্দী, গণীমত, শহর বিজয় ইত্যাদির মাধ্যমে কাফেরদের এক শক্তি ও ভিত্তি ভেঙে দেবেন; ফলে মুমিনরা শক্তিশালী হবে ও কাফেররা দুর্বল হবে। কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের মূল শক্তি হল সৈন্য, ধন-সম্পদ, অস্ত্র ও ভূ-সম্পত্তি। এসব কিছুর মধ্যে কোন কিছু যদি দুর্বল করে দেয়া যায়, তবে তাদের শক্তি কমে যাবে। দুই. কাফেররা মুসলিমদের উপর জয়ী হওয়ার জন্য আশা করবে এবং প্রচেষ্টা চালাবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদেরকে বিজয়ী করবেন ফলে তারা লাঞ্ছিত ও নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে। মূলত আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য দু'টির কোন একটি হয়ে থাকে; হয় তিনি মুসলিমদেরকে কাফেরদের উপর বিজয়ী করবেন, নতুবা কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। আয়াতে এ দু'টি দিকই উল্লেখ করা হয়েছে। [তাফসীর সা'দী]

তারা তো যালেম[১]।

১২৯. আর আসমানে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

চৌদ্দতম রুকূ‘

১৩০. হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ[২]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰٓوا

(১) এখান থেকে আবারো ওহুদের ঘটনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। মাঝখানে সংক্ষেপে বদর যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এ আয়াত অবতরনের কারণ এই যে, ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখস্থ উপর ও নীচের চারটি দাঁতের মধ্যে থেকে নীচের পাটির ডান দিকের একটি দাত পড়ে গিয়েছিল এবং মুখমণ্ডল আহত হয়ে পড়েছিল। এতে দুঃখিত হয়ে তিনি এ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেনঃ "যারা নিজেদের নবীর সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে, তারা কেমন করে সাফল্য অর্জন করবে? অথচ নবী তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেন।" এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। [বুখারী, মুসলিমঃ ১৭৯১] এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু থেকে উঠার পর কাফেরদের উপর বদ দো'আ করতেন, কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি তা ত্যাগ করেন। [বুখারীঃ ৪৫৬০, ৪০৬৯, ৪০৭০ মুসলিমঃ ৬৭৫]

(২) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমর ইবনে আকইয়াশের জাহেলী যুগের কিছু সুদের কারবার ছিল সে তা উসুল করা জন্য ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। তারপর যখন উহুদ যুদ্ধের দিন আসল, সে জিজ্ঞাসা করল, আমার চাচাত ভাই অমুক কোথায়? লোকেরা বলতঃ উহুদের প্রান্তরে, আবার জিজ্ঞাসা করতঃ অমুক কোথায়? তারা বলতঃ উহুদের প্রান্তরে, আবার জিজ্ঞাসা করলঃ অমুক কোথায়? লোকেরা বলতঃ সেও উহুদের প্রান্তরে। এতে সে তার যুদ্ধাস্ত্র পরে নিয়ে উহুদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে। মুসলিমগণ যখন তাকে দেখল তখন তারা বললঃ আমর! তুমি আমাদের থেকে দূরে থাক। কিন্তু সে জবাব দিল 'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি'। তারপর সে যুদ্ধ করে আহত হলো, তাকে তার পরিবারের কাছে আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হল। সা'দ ইবনে মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এসে তার বোনকে বললেন তুমি তাকে জিজ্ঞাসা কর সে কি জাতিকে বাঁচানোর জন্য, নাকি তাদের ক্রোধে শরীক হওয়ার জন্য, নাকি আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করেছে? তখন আমর জবাবে বললঃ বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছি। তারপর তিনি মারা

اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

খেয়ো না[১] এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝

১৩১. আর তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে[২]।

গেলেন। ফলে জান্নাতে প্রবেশ করলেন, অথচ আল্লাহ্‌র জন্য এক ওয়াক্ত সালাত পড়ারও সুযোগ তার হয়নি। [আবু দাউদঃ ২৫৩৭, ইসাবাঃ ২/৫২৬] হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ আমি সর্বদা খুঁজে বেড়াতাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা উহুদের ঘটনার মাঝখানের সুদের কথা কেন নিয়ে আসলেন, তারপর যখন এ ঘটনা পড়লাম তখন আমার কাছে এ আয়াতকে এখানে আনার যোক্তিকতা স্পষ্ট হলো। [আল উজাবঃ ২/৭৫৩]

(১) আলোচ্য আয়াতে কয়েকগুণ বেশী অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি হারকে সুদ হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে অত্যন্ত কঠোরভাবে সর্বাবস্থায় সুদ হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। "আয়াতে চক্রবৃদ্ধি হারে" সুদ খাওয়া নিষেধ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ থেকে বেঁচেও থাকে, তবে সুদের উপার্জনকে যখন পুনরায় সুদে খাটাবে, তখন অবশ্যই দ্বিগুণের দ্বিগুণ হতে থাকবে- যদিও সুদখোরদের পরিভাষায় একে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হবে না। সারকথা, সব সুদই পরিণামে দ্বিগুণের ওপর দ্বিগুন সুদ হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতে সবরকম সুদকেই নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা ধ্বংসকারী সাতটি বিষয় হতে বেঁচে থাকবে, সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে বিষয়গুলো কি কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করা, জাদু করা, যথার্থ কারণ ছাড়া আল্লাহ্ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, অন্যায়ভাবে ইয়াতিমের মাল ভক্ষন করা, যুদ্ধ অবস্থায় জেহাদের ময়দান হতে পলায়ণ করা, পবিত্রা মুসলিম নারীর উপর ব্যাভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া।' [বুখারীঃ ২৭৬৬]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের সবার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা এমনভাবে কথা বলবেন যে, তার ও আল্লাহ্‌র মাঝে কোন অনুবাদকারী থাকবে না। তারপর প্রত্যেকে তার সামনে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর সামনে তাকিয়ে দেখবে যে, জাহান্নাম তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসছে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন একটি খেজুরের অংশ বিশেষ দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচায়।" [বুখারী: ৬৫৩৯]

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. আর তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার(১)।

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. আর তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে(২) যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও

(১) আলোচ্য আয়াতে দু'টি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ (এক) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সাথে রাসূলের আনুগত্যেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা জানা কথা যে, রাসূলের আনুগত্য হুবহু আল্লাহ্র আনুগত্য বোঝায়। তারপরও এখানে রাসূলের আনুগত্যকে পৃথক করে বর্ণনা করার তাৎপর্য স্বয়ং আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয়। এতে আল্লাহ্র করুণালাভের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যকে যেমন অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য করা হয়েছে, তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যকেও জরুরী ও অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু এ আয়াতেই নয়, বরং সমগ্র কুরআনে বার বার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং যেখানেই আল্লাহ্র আনুগত্যের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই রাসূলের আনুগত্যকেও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন পাকের এই উপর্যুপরি ও অব্যাহত বাণী ইসলাম ও ঈমানের এ মূলনীতির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, ঈমানের প্রথম অংশ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ তথা অস্তিত্ব, প্রভুত্ব, নাম ও গুণ এবং ইবাদাত তথা দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য করা। (দুই) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মকবুল ও নিষ্ঠাবান পরহেযগার বান্দার গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য শুধু মৌখিক দাবীকে বলা হয় না, বরং গুণাবলী ও লক্ষণাদির দ্বারাই আনুগত্যকারীর পরিচয় হয়। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর বর্ণনা আসছে।

(২) এ আয়াতে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতামুলকভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের পর এটি দ্বিতীয় নির্দেশ। এখানে ক্ষমার অর্থ আল্লাহ্র কাছে সরাসরি ক্ষমা চাওয়া হতে পারে। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে এমন সব সৎকর্ম এর উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা লাভ করার কারণ হয়। এটাই মত। সাহাবী ও তাবে'য়ীগণ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু সারমর্ম সবগুলোরই এক। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন, 'কর্তব্য পালন'। ইবনে-আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন, 'ইসলাম'। আবুল 'আলিয়া বলেছেন 'হিজরত'। আনাস ইবনে-মালেক বলেছেন 'সালাতের প্রথম তাকবীর। সায়ীদ ইবনে-জুবায়ের বলেছেন 'ইবাদাত পালন'। দাহ্হাক বলেন 'জিহাদ'। আর ইকরিমা বলেছেন 'তওবা'। এসব উক্তির সারকথা এই যে, ক্ষমা বলে এমন সৎকর্ম বুঝানো

যমীনের সমান[১], যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে

হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে।

এখানে দু'টি বিষয় জানা আবশ্যক। এক. শ্রেষ্ঠত্ব দু'প্রকারঃ এক, ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা অর্জন করা মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির বাইরে। এগুলোকে অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। উদাহরণতঃ শ্বেতাঙ্গ হওয়া, সুশ্রী হওয়া ইত্যাদি। দুই, ঐ শ্রেষ্ঠত্ব , যা মানুষ অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে পারে। এ গুলোকে ইচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা এবং বাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। [যেমন, সূরা আন-নিসা: ৩২] কারণ, এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্‌ স্বীয় হেকমত অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বন্টন করেছেন। এতে কারও চেষ্টার কোন দখল নাই। সুতরাং যত চেষ্টা ও বাসনাই করা হোক না কেন এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে না। চেষ্টাকারীর মনে হিংসা ও শত্রুতার আগুন জ্বলা ছাড়া আর কোন লাভ হবে না। তবে যে সব শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে মানুষের ইচ্ছা শক্তি কাজ করে থাকে সেগুলোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্জন করার নির্দেশ বহু আয়াতে দেয়া হয়েছে। ঠিক এ আয়াতেও আল্লাহ্‌র ক্ষমার কারণ হয় এমন যাবতীয় কাজ করে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেননা এটা মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয়।

দুই. আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াতে ক্ষমাকে জান্নাতের পূর্বে উল্লেখ করে সম্ভবতঃ এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জান্নাত লাভ করা আল্লাহ্‌র ক্ষমা ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা, মানুষ যদি জীবনভর পুণ্য অর্জন করে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তবুও তার সমগ্র পুণ্যকর্ম জান্নাতের মুল্য হতে পারে না। জান্নাত লাভের পন্থা মাত্র একটি। তা' হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্ষমা ও অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'সততা ও সত্য অবলম্বন কর, মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ কর এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ কর। কারও কর্ম তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। শ্রোতারা বললোঃ আপনাকেও নয়কি- ইয়া রাসূলাল্লাহ। উত্তর হলোঃ আমার কর্ম আমাকেও জান্নাতে নেবে না। তবে আল্লাহ্‌ যদি স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন।' [বুখারীঃ ৫৩৪৯, মুসলিমঃ ২৮১৬] মোটকথা এই যে, আমাদের কর্ম জান্নাতের মূল্য নয়। তবে আল্লাহ্‌ তাআয়ালার রীতি এই যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ঐবান্দাকেই দান করেন, যে সৎকর্ম করে। বরং সৎকর্মের সামর্থ্য লাভ হওয়াই আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষণ। অতএব সৎকর্ম সম্পাদনে ত্রুটি করা উচিৎ নয়।

(১) আয়াতে জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের সমান। নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের চাইতে বিস্তৃত কোন বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এ কারণে জান্নাতের প্রস্থতাকে এ দু'টির সাথে তুলনা করে বুঝানো হয়েছে যে, জান্নাত খুবই বিস্তৃত। প্রশস্ততায় তা নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডলকে নিজের মধ্যে ধরে নিতে পারে। এর প্রশস্ততাই যখন এমন, তখন দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। অবশ্য কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ জান্নাত দৈর্ঘ ও প্রস্থে

মুত্তাকীদের জন্য(১)।

১৩৪. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয়(২) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ

সমান। কেননা তা আরশের নীচে গম্বুজের মত। গম্বুজের মত গোলাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হয়ে থাকে। এ বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, তিনি বলেছেনঃ 'তোমরা যখন আল্লাহ্র কাছে জান্নাত চাইবে তখন ফেরদাউস চাইবে; কেননা তা সর্বোচ্চ জান্নাত, সবচেয়ে উত্তম ও মধ্যম স্থানে অবস্থিত জান্নাত, সেখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত। আর তার ছাদ হলো দয়াময় আল্লাহ্র আরশ। [বুখারীঃ ২৭৯০, ৭৪২৩]

তবে আয়াতের এ ব্যাখ্যা তখন হবে, যখন عرض শব্দের অর্থ طول তথা দৈর্ঘ্যের বিপরীতে নেয়া হয়। কিন্তু যদি এর অর্থ হয় 'মূল্য' তবে আয়াতের অর্থ হবে যে, জান্নাত কোন সাধারণ বস্তু নয়- এর মূল্য সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডল। সুতরাং এহেন মূল্যবান বস্তুর প্রতি ধাবিত হও। কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ আয়াতে উল্লেখিত عرض শব্দের অর্থ ঐ বস্তু যা বিক্রিত বস্তুর মোকাবেলায় মূল্য হিসেবে পেশ করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যদি জান্নাতের মূল্য ধরা হয়, তবে সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভুমণ্ডল এবং এতদুভয়ের সবকিছু হবে এর মূল্য। এতে করে জান্নাত যে অমূল্য বিষয় তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। [তাফসীরে কাবীর]

(১) জান্নাতের দ্বিতীয় বিশেষণে বলা হয়েছেঃ জান্নাত মুত্তাকীগণের জন্যে নির্মিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, জান্নাত সৃষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাত তৈরী হয়ে আছে। আর এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা-বিশ্বাস। তাছাড়া কুরআন ও হাদীসে জান্নাতের যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে সেগুলোতে কোথাও কোথাও স্পষ্ট করে বলা আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন। যেমন জান্নাতের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতের এক ইট রৌপ্যের ও এক ইট স্বর্ণের, তার নীচের আস্তর সুগন্ধি মিশকের, তার পাথরকুচিগুলো হীরে-মুতি-পান্নার সমষ্টি, মিশ্রণ হচ্ছে, ওয়ারস ও যা'ফরান। যে তাতে প্রবেশ করবে সে তাতে স্থায়ী হবে, মরবে না, নিয়ামত প্রাপ্ত হবে, হতভাগা হবে না, যৌবন কখনও ফুরিয়ে যাবে না, কাপড়ও কখনও ছিড়ে যাবে না।" [মুসনাদে আহমাদ ২/৩০৪, ৩০৫, সহীহ ইবন হিব্বানঃ ১৬/৩৯৬]

(২) অর্থাৎ মোত্তাকী তারাই, যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত। স্বচ্ছলতা হোক কিংবা অভাব-অনটন হোক, সর্বাবস্থায় তারা সাধ্যানুযায়ী ব্যয় কার্য অব্যাহত রাখে। বেশী হলে বেশী এবং কম হলে কমই ব্যয় করে। এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে নিজেকে মুক্ত মনে করবে না এবং সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখবে না। অপর দিকে আয়াতে এ নির্দেশও রয়েছে যে, অভাব-অনটনেও সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য

الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী(১) এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আর আল্লাহ্ মুহ্সিনদেরকে ভালবাসেন;

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى

১৩৫. আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

অব্যাহত রাখলে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার কল্যাণকর অভ্যাসটি বিনষ্ট হবে না। সম্ভবতঃ এর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন। স্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটন উল্লেখ করার আরও একটি রহস্য সম্ভবতঃ এই যে, এ দু'অবস্থায়ই মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে যায়। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য হলে আরাম-আয়েশে ডুবে মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে যায়। অপরদিকে অভাব-অনটন থাকলে প্রায়ই সে চিন্তামগ্ন হয়ে আল্লাহ্র প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা আরাম-আয়েশেও আল্লাহ্কে ভুলে না কিংবা বিপদাপদেও আল্লাহ্র প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে না।

(১) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'ঘায়েল বা পরাভূত করতে পারাটাই বীর হওয়ার লক্ষণ নয়, বীর হল ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে ক্রোধের সময় সম্বরণ করতে পেরেছে'। [বুখারীঃ ৬১১৪, মুসলিমঃ ২৬০৯] অনুরূপভাবে এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেনঃ আমাকে এমন একটি কথা বলুন যা আমার কাজে আসবে, আর তা সংক্ষেপে বলুন যাতে আমি তা আয়ত্ব করতে পারি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ রাগ করো না । সাহাবী বার বার একই প্রশ্ন করলেন আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই উত্তর দিলেন। [বুখারী: ৬১১৬; মুসনাদের আহমাদঃ ৫/৩৪] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে ক্ষমার বিনিময়ে কেবল সম্মানই বৃদ্ধি করে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তাকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেন'। [তিরমিযীঃ ২৩২৫, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৪৩১] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন ক্রোধকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হওয়া সত্বেও দমন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে ডেকে যে কোন হূর পছন্দ করে নেয়ার অধিকার দিবেন"। [ইবন মাজাহ: ৪১৮৬] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্র কাছে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্রোধ সম্বরণ করার চেয়ে বড় কোন সম্বরণ বেশী সওয়াবের নেই।" [ইবন মাজাহ: ৪১৮৯]

مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

করে। আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে[১]? এবং তারা যা করে ফেলে, জেনে-বুঝে তারা তা পুনরায় করতে থাকে না।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. তারাই, যাদের পুরস্কার হলো তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতইনা উত্তম!

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কোন এক ব্যক্তি গোনাহ করার পর বললঃ হে আল্লাহ! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আবার আরেকটি গোনাহ করে আবারও বললঃ হে রব! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম। তারপর সে আবার আরেকটি গোনাহ করে আবারও বললঃ হে রব! আমি গোনাহ করেছি সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ আমার বান্দা গোনাহ করেছে এবং এটা জেনেছে যে, তার একজন রব আছে যিনি তার গোনাহ মাফ করবে ও তাকে পাকড়াও করবে; আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম, সে যাই করুক না কেন। [বুখারীঃ ৭৫০৭, মুসলিমঃ ২৭৫৮] আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে আবু বকর হাদীস শুনিয়েছে। আর আবু বকর সত্য বলেছে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, "কোন লোক যদি গুনাহ করে, তারপর পাক-পবিত্র হয় এবং সালাত আদায় করে, তারপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন।" [তিরমিযী: ৪০৬; ইবন মাজাহ: ১৩৯৫; আবু দাউদ: ১৫২১] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, "তোমরা দয়া কর, তোমাদেরকেও রহমত করা হবে, তোমরা ক্ষমা করে দাও আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, যারা কোন কথা না শোনার জন্য নিজেদেরকে বন্ধ করে নিয়েছে তাদের জন্য ধ্বংস, যারা অন্যায় করার পর জেনে-বুঝে বারবার করে তাদের জন্যও ধ্বংস"। [মুসনাদে আহমাদ: ২/১৬৫]

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. তোমাদের পূর্বে বহু (জাতির) চরিত গত হয়েছে(১), কাজেই তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কি পরিণাম(২)!

هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. এগুলো মানুষের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিত ও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও(৩)।

(১) মুজাহিদ বলেন, এখানে 'সুনান' বলে কাফের, মুমিন, ভাল-মন্দ যে সমস্ত চরিত চলে গেছে তা বোঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) কাতাদা বলেন, এর অর্থ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে অল্প কিছুদিন উপভোগ দিয়েছি, তারপর তাদেরকে জাহান্নামে দিয়ে দিয়েছি। [তাবারী]

(৩) আলোচ্য আয়াতে মুসলিমদের হতাশ না হতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে ওহুদের যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করার পর কিছুক্ষণের জন্য মুসলিমরা পরাজয় বরণ করে। সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহত হন। কিন্তু এ সবের পর আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়। এ সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি। (এক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি। (দুই) খোদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলিমদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। (তিন) মদীনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলিমদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। মুসলিম বীরদের মৃতদেহ ছিল চোখের সামনে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও হতভাগারা আহত করে দিয়েছিলো। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যেও বেদনায় মুষড়ে পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে দু'টি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। (এক) অতীত ঘটনার জন্য দুঃখ ও বিষাদ। (দুই) আশঙ্কা যে, ভবিষ্যতের জন্য মুসলিমগণ যেন দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, অনুরূপ আঘাত তো ওদেরও লেগেছে। মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আমরা এ দিনগুলোর আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ্ মুমিনগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন। আর আল্লাহ্ যালেমদেরকে পছন্দ করেন না।

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾

১৪১. আর যাতে আল্লাহ্ মুমিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনো প্রকাশ করেননি[১]?

এ জাতি অঙ্কুরেই মনোবল হারিয়ে না ফেলে। এ দুইটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্যে কুরআনের এ বাণীতে বলা হয় যে, 'ভবিষ্যতের জন্যে তোমরা দৌর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাছে আসতে দিয়ো না এবং অতীতের জন্যেও বিমর্ষ হয়ো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাক এবং আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদার উপর ভরসা রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও আল্লাহ্র পথে জেহাদে অনড় থাক, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।' উদ্দেশ্য এই যে, অতীতে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ভবিষ্যতে সংশোধনের চিন্তা করা দরকার। ঈমান, বিশ্বাস ও রাসূলের আনুগত্য উজ্জল ভবিষ্যতের দিশারী। এগুলো হাতছাড়া হতে দিয়ো না। পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।

(১) এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত নিয়ম হচ্ছে যে, তিনি কাউকে পরীক্ষা না করে জান্নাতে দিবেন না। তিনি তাদেরকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে তারপর সে পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। পবিত্র কুরআনে এ কথাটি বারবার ঘোষিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার আগে তোমরা তো তা কামনা করতে(১), এখনতো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখলে।

পনরতম রুকূ'

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۭ اَفَاۗىِٕنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۭ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰي عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـــًٔا ۭ وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. আর মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র; তার আগে বহু রাসূল গত হয়েছেন। কাজেই যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? আর কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহ্‌র ক্ষতি করবে না; আর আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন(২)।

কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত অবস্থা আসেনি? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত-কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সংগী-সাথী ঈমানদারগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে?" [সূরা আল-বাকারাহ: ২১৪] আরও বলেন, "তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে যতক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ্ না প্রকাশ করেন তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ এবং কারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি?" [আত-তাওবাহ: ১৬] আরও এসেছে "মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে ?" [সূরা আল-আনকাবূত:২]

(১) মৃত্যু বা বিপদ কামনা করা জায়েয নেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাত কামনা করো না; আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা চাও, তবে যদি তারপরও সাক্ষাত হয়ে যায় তা হলে ধৈর্য ধারন কর এবং জেনে রাখ যে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে'। [বুখারীঃ ২৯৬৬, মুসলিমঃ ১৭৪২]

(২) এ আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিওয়া সাল্লাম একদিন না একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। তার পরও মুসলিমদের দ্বীনের উপর অটল থাকতে হবে। এতে আরো বুঝা যায় যে, সাময়িক বিপর্যয়ের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহত হওয়া এবং তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ার পেছনে যে রহস্য ছিল, তা হলো তাঁর জীবদ্দশাতেই তার মৃত্যু-পরবর্তী সাহাবায়ে-কেরামের সম্ভাব্য অবস্থার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা- যাতে তাদের মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তা

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِي الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু সেটার মেয়াদ সুনির্ধারিত(১)। কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে আমরা তাকে তার কিছু দিয়ে থাকি(২) এবং কেউ আখেরাতের পুরস্কার চাইলে আমরা তাকে তার কিছু দিয়ে থাকি এবং শীঘ্রই আমরা কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবো।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. আর বহু নবী ছিলেন, তাদের সাথে বিরাট সংখ্যক (ঈমান ও আমলে সালেহ্‌র উপর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) লোক যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্‌র পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি। আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন।

সংশোধন করে দেন এবং পরে সত্যসত্যই যখন তার মৃত্যু হবে, তখন যেন সম্বিত হারিয়ে না ফেলেন। বাস্তবে তাই হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় যখন প্রধান প্রধান সাহাবীগণও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, তখন আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এ আয়াত তেলাওয়াত করেই তাদের সান্ত্বনা দেন। [দেখুন, বুখারীঃ ১২৪১, ১২৪২, ৪৪৫৩, ৪৪৫৪]

(১) এ আয়াতেও বিপদাপদের সময় অটল থাকার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মৃত্যুর দিন, তারিখ, সময় সবই নির্ধারিত, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কারো মৃত্যু হবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরও কেউ জীবিত থাকবে না। এমতাবস্থায় কারো মৃত্যুতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কোন অর্থ নেই।

(২) এ আয়াত থেকে এটা বুঝার সুযোগ নেই যে, দুনিয়া চাইলেই তাকে তা দেয়া হবে। কারণ, অন্য আয়াতে এটা শর্তসাপেক্ষে দেয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সে শর্ত হচ্ছে, সেটা দেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থাকতে হবে। যেমন বলা হয়েছে, "কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছে এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি" [সূরা আল-ইসরা: ১৮]

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. এ কথা ছাড়া তাদের আর কোন কথা ছিল না, 'হে আমাদের রব! আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজের সীমালংঘন আপনি ক্ষমা করুন, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখুন এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।'

فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কার এবং আখেরাতের উত্তম পুরস্কার দান করেন। আর আল্লাহ্ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন।

ষোলতম রুকূ'

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تُطِيعُوا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. হে মুমিনগণ! যদি তোমরা কাফেরদের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবে ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّٰصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. বরং আল্লাহ্ই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا ۖ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۖ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٥١﴾

১৫১. অচিরেই আমরা কাফেরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব[১], যেহেতু তারা আল্লাহ্র সাথে শরীক করেছে, যার সপক্ষে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠাননি। আর জাহান্নাম তাদের আবাস এবং কত নিকৃষ্ট আবাস যালেমদের।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ فِى

১৫২. অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমাকে একমাসে অতিক্রম করার মত রাস্তার দূরত্ব থেকে কাফেরদের মনে ভয় ঢুকিয়ে সাহায্য করা হয়েছে'। [বুখারীঃ ৩৩৫, মুসলিমঃ ৫২১, ৫২৩]

الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَآ أَرٰىكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কিছু সংখ্যক দুনিয়া চাচ্ছিল(১) এবং কিছু সংখ্যক চাচ্ছিল আখেরাত। তারপর তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তাদের (তোমাদের শত্রুদের) থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন(২)। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে

(১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আয়াতের এ অংশ নাযিল হবার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে কেউ দুনিয়া চায়, এটি আমার ধারনাও আসে নি। [মুসনাদে আহমাদ ১/৪৬৩]

(২) বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধে পঞ্চাশ জনের এক দল সাহাবীকে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নেতৃত্বে দিয়ে বললেনঃ যদি তোমরা দেখ যে, পাখি আমাদেরকে ছুঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে তাতেও তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করে যাবে না। যতক্ষন না আমি তোমাদেরকে ডেকে পাঠাই। অনুরূপভাবে যদি তোমরা দেখ যে, আমরা শত্রুদের পর্যুদস্ত করে দিয়েছি তাতেও তোমরা স্থান ত্যাগ করবে না যতক্ষণ আমি তোমাদের ডেকে না পাঠাই। তারপর মুসলিমগণ কাফেরদের পরাজিত করল। বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ আমি মহিলাদের চুড়ি, পায়ের গোড়ালি ইত্যাদিও দেখছিলাম, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরের সাথীগণ বলতে আরম্ভ করলঃ গনীমতের মাল এসে পড়েছে, তোমাদের সাথীরা কাফেরদের উপর জয়লাভ করেছে, সুতরাং তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবাইর তাদেরকে বললেনঃ তোমরা কি রাসূলের নির্দেশ ভূলে গেছ? তারা বললঃ আমরা মানুষের কাছে গিয়ে গনীমতের মাল জমা করব। একথা বলে তারা স্থান ত্যাগ করতে আরম্ভ করল। আর এতেই যুদ্ধের পট পরিবর্তিত হয়ে জয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল। সবাই পালাতে আরম্ভ করল। রাসূলের সাথে মাত্র বার জন লোক ছিল। রাসূল তাদেরকে ডাকতে থাকলেন। এভাবে মুসলিমদের সত্তর জন লোক শহীদ হয়ে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীরা বদরের দিন একশত চল্লিশ জন কাফেরকে পর্যুদস্ত করতে পেরেছিলেন, তাদের সত্তর জন মারা যায় আর বাকী সত্তর জন আহত হয়ে বন্দী হয়। তখন আবু সুফিয়ান তিন বার বললঃ এখানে কি মুহাম্মাদ আছে? সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে উত্তর দিতে নিষেধ করলেন। তারপর আবু সুফিয়ান

ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের (পাহাড়ের) দিকে ছুটছিলে এবং পিছন ফিরে কারো প্রতি লক্ষ্য করছিলে না, আর রাসূল তোমাদেরকে পিছন দিক থেকে ডাকছিলেন। ফলে তিনি তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন(১), যাতে তোমরা যা হারিয়েছ এবং যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।

তিন বার বললঃ এখানে কি ইবনে আবি কুহাফা আছে? তারপর আবু সুফিয়ান তিনবার বললঃ এখানে কি ইবনুল খাত্তাব আছে? তারপর সে তার সাথীদের কাছে ফিরে গিয়ে বললঃ এরা সবাই মারা পড়েছে। তখন উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। তিনি বলে বসলেনঃ হে আল্লাহ্‌র দুশমন! তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি যাদের কথা বলেছ তারা সবাই জীবিত। আর তোমার যাতে খারাপ লাগে তা অবশ্যই বাকী আছে। তখন আবু সুফিয়ান বলে বসলঃ বদরের দিনের বদলে একটি দিন হলো আজ। আর যুদ্ধে জয়- পরাজয় আছেই। তুমি তোমাদের মৃতদের মাঝে কিছু বিকৃত লাশ দেখতে পাবে। আমি বিকৃত করার নির্দেশ দেইনি। কিন্তু আমার খারাপও লাগেনি। তারপর সে আবৃতি করতে লাগলঃ হুবলের জয় হোক, হুবলের জয় হোক। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা কি তার জবাব দিবে না? সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আমরা কি বলব? তিনি বললেনঃ 'তোমরা বলঃ আল্লাহ্ মহান ও সর্বোচ্চ। তখন আবু সুফিয়ান বললঃ আমাদের 'উয্যা আছে তোমাদের উয্যা নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা জবাব দিবে না? সাহাবগণ বললেনঃ কি জবাব দেব? তিনি বললেনঃ বল যে, আল্লাহ্ আমাদের অভিভাবক-সাহায্যকারী, তোমাদের কোন অভিভাবক-সাহায্যকারী নেই। [বুখারীঃ ৩০৩৯, ৩৯৮৬, ৪০৪৩, ৪০৬৭, ৪৫৬১]

(১) কাতাদা বলেন, প্রথম বিপদ হচ্ছে, আহত-নিহত হওয়া। আর দ্বিতীয় বিপদ হচ্ছে, যখন তাদের কাছে খবর পৌঁছল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন। তখন তারা নিজেদের আহত-নিহত হওয়ার চেয়েও বেশী চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. তারপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন তন্দ্রারূপে প্রশান্তি, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল[১] এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এ বলে যে, 'আমাদের কি কোন কিছু করার আছে'? বলুন, 'সব বিষয় আল্লাহ্রই ইখতিয়ারে'। যা তারা আপনার কাছে প্রকাশ করে না, তারা তাদের অন্তরে সেগুলো গোপন রাখে। তারা বলে, 'এ ব্যাপারে আমাদের কোন কিছু করার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না[২]।' বলুন, 'যদি তোমরা

(১) অর্থাৎ এ কঠিন বিপদের সময় তাদের উপর তন্দ্রা নেমে এসে তাদেরকে প্রশান্ত করে দিচ্ছিল। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা ওহুদের দিন কাতারবন্দী অবস্থাতেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। এমনকি আমাদের হাত থেকে তরবারী পড়ে যাচ্ছিল আর আমি বারবার তা উঠিয়ে নিচ্ছিলাম।' [বুখারী: ৪৫৬২] আর এটাই আল্লাহ্র বাণী "তারপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন তন্দ্রারূপে প্রশান্তি, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল, এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল" এর তাৎপর্য। আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যুদ্ধের মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আর সালাতের মধ্যে শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। [ইবন আবী হাতেম; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এখানে আরেক দল বলে মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে। তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তারা সবচেয়ে ভীতু ও কাপুরুষ ও হক্বের বিপরীতে অবস্থানকারী সম্প্রদায় ছিল। [তাবারী] আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেনঃ উহুদের যুদ্ধের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, আল্লাহ্ আমাদের উপর ঘুম পাঠালেন, আমাদের প্রত্যেকের থুতনি বুকে লেগে যাচ্ছিল। আল্লাহ্র শপথ আমি যেন মু'আত্তাব ইবনে কুসাইরের কথা স্বপ্নের মাঝে শুনছিলাম। সে বলছিলঃ 'এ ব্যাপারে আমাদের কোন কিছু করার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না' এ ব্যাপারেই আল্লাহ্র উপরোক্ত বাণী নাযিল হয়। [আল-আহাদিসুল মুখতারাহঃ ৩/৬০, ৮৬৪]

তোমাদের ঘরে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হত। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের মনে যা আছে তা পরিশোধন করেন। আর অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবগত।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের ফলে শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন(১)।

(১) সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ও বিশ্বাস এই যে, যদিও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম নিস্পাপ নন, তাদের দ্বারা বড় কোন পাপ সংঘটিত হয়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু তা সত্ত্বেও উম্মতের জন্য তাদের কোন দোষচর্চা কিংবা দোষ আরোপ করা জায়েয নয়। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের এত বড় পদস্খলন ও অপরাধ মার্জনা করে তাদের প্রতি দয়া ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং তাদের ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ অর্থাৎ "তাদের উপর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট" [সূরা আত্-তাওবাহ্ঃ ১০০, সূরা আল-মুজাদালাহঃ ২২] -এ মহাসম্মানজনক মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, তখন তাদেরকে কোন প্রকার অশালীন উক্তিতে স্মরণ করার কোন অধিকার অপর কারো পক্ষে কেমন করে থাকতে পারে? সে জন্যই এক সময় কোন এক সাহাবী যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী সম্পর্কে ওহুদ যুদ্ধের এই ঘটনার আলোচনায় বলেছেন যে, এরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর বললেনঃ আল্লাহ্ নিজে যে বিষয়ের ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন, সে বিষয়ে সমালোচনা করার কোন অধিকার কারো নেই। [দেখুন, বুখারীঃ ৪০৬৬]
শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ 'আহলে-সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যেসব মতবিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে, সে সম্পর্কে কারো প্রতি কোন আপত্তি উত্থাপন কিংবা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা। কারণ, ইতিহাসে যেসব বর্ণনায় তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ

নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল।

সতেরতম রুকূ'

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَقَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا۟ غُزًّى لَّوْ كَانُوا۟ عِندَنَا مَا مَاتُوا۟ وَمَا قُتِلُوا۟ لِيَجْعَلَ

১৫৬. হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা কুফরী করে এবং তাদের ভাইয়েরা যখন দেশে দেশে সফর করে(১) বা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন

তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যা ও ভ্রান্ত; যা শত্রুরা রটিয়েছে। আর কোন কোন ব্যাপার রয়েছে যে গুলোতে কম-বেশী করা হয়েছে এবং যেগুলো প্রকৃতই শুদ্ধ সেগুলোও একান্তই সাহাবীগণের স্ব স্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে বিধায় তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। বস্তুতঃ ঘটনা বিশেষের মধ্যে যদি তারা সীমালঙ্ঘন করেও থাকেন, তবুও আল্লাহ্ তা'আলার রীতি হলো ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾ সৎকাজের মাধ্যমে অসৎ কর্মের কাফ্ফারা হয়ে যায়। বলাবাহুল্য সাহাবায়ে কেরামের সৎকর্মের সমান অন্য কারো কর্মই হতে পারে না। কাজেই তারা আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমার যতটুকু যোগ্য, তেমন অন্য কেউ নয়। সে জন্যই তাদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার অন্য কারো নেই। তাদের ব্যাপারে কটুক্তি বা অশালীন মন্তব্য করার অধিকারও অন্য কারো নেই।' [আল-আকিদাতুল ওয়াসেতিয়্যা]

(১) সুদ্দী বলেন, এখানে দেশে দেশে সফর করা বলে, ব্যবসা করা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন আবী হাতেম] অর্থাৎ মুনাফিকদের যখন কোন লোক মারা যেত, তখন তারা বলত: যদি আমাদের কথা শুনতো এবং যুদ্ধে বের না হতো তবে তারা মারা যেতো না। বস্তুত মুনাফিকরা যুদ্ধের আগেই তাদের ভাইদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিত। অন্য আয়াতে এসেছে, "যারা ঘরে বসে রইল এবং তাদের ভাইদেরকে বলল যে, তারা তাদের কথামত চললে নিহত হত না" [সূরা আলে ইমরান: ১৬৮] আরও এসেছে, "যারা পিছনে রয়ে গেল তারা আল্লাহ্র রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতেই আনন্দ বোধ করল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপছন্দ করল এবং তারা বলল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না।"[সূরা আত-তাওবাহ: ৮১] আরও এসেছে, " আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা বাধাদানকারী এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, 'আমাদের দিকে চলে এসো।' তারা অল্পই যুদ্ধে যোগদান করে" [সূরা আল-আহযাব: ১৮] আরও এসেছে, "তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করবেই। তোমাদের কোন মুসীবত হলে সে বলবে, 'তাদের সংগে না থাকায় আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।" [সূরা আন-নিসা:৭২]

اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسۡرَةً فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ ؕ وَاللّٰهُ يُحۡىٖ وَيُمِيۡتُ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ۝١٥٦

তাদের সম্পর্কে বলে, 'তারা যদি আমাদের কাছে থাকত তবে তারা মরতো না এবং নিহত হত না।' ফলে আল্লাহ্ এটাকেই তাদের মনে দুঃখ ও চিন্তা সৃষ্টির কারণে পরিণত করেন; প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ সেসবের সম্যক দ্রষ্টা।

وَلَئِنۡ قُتِلۡتُمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اَوۡ مُتُّمۡ لَمَغۡفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحۡمَةٌ خَيۡرٌ مِّمَّا يَجۡمَعُوۡنَ ۝١٥٧

১৫৭. তোমরা আল্লাহ্র পথে নিহত হলে অথবা তোমাদের মৃত্যু হলে, যা তারা জমা করে, আল্লাহ্র ক্ষমা এবং দয়া অবশ্যই তার চেয়ে উত্তম।

وَلَئِنۡ مُّتُّمۡ اَوۡ قُتِلۡتُمۡ لَاِ اِلَى اللّٰهِ تُحۡشَرُوۡنَ ۝١٥٨

১৫৮. আর তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে আল্লাহ্রই কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

فَبِمَا رَحۡمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنۡتَ لَهُمۡ ۚ وَلَوۡ كُنۡتَ فَظًّا غَلِيۡظَ الۡقَلۡبِ لَانۡفَضُّوۡا مِنۡ حَوۡلِكَ ۖ فَاعۡفُ عَنۡهُمۡ وَاسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِى الۡاَمۡرِ ۚ فَاِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُتَوَكِّلِيۡنَ ۝١٥٩

১৫৯. আল্লাহ্র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন[১]; যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন[২], তারপর আপনি

(১) আবু উমামা আল বাহেলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেনঃ 'হে আবু উমামা! মুমিনদের মাঝে কারো কারো জন্য আমার অন্তর নরম হয়ে যায়'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২১৭]

(২) অর্থাৎ ইতোপূর্বে যেমন কাজে-কর্মে এবং কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন, তেমনিভাবে এখনও তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তাদের মনে প্রশান্তি আসতে পারে। এতে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, কল্যাণ কামনার যে অনুরাগ তাদের অন্তরে বিদ্যমান, তা তাদেরকে পরামর্শের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে প্রকাশ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে বলেছেন, "যার কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়,

কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবেন(১); নিশ্চয় আল্লাহ্ (তার

সে আমানতদার" । [ইবন মাজাহ: ৩৭৪৫] অর্থাৎ সে আমানতের সাথে পরামর্শ দিবে, ভুল পথে চালাবে না এবং আমানত হিসেবেই সেটা তার কাছে রাখবে ।

এই আয়াতে সমাজ সংস্কারক ও দ্বীন-প্রচারকদের জন্য কয়েকটি বিষয়কে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে । প্রথমতঃ আচার-ব্যবহার ও কথা-বার্তায় রূঢ়তা পরিহার করা । দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোকদের দ্বারা কোন ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে কিংবা কষ্টদায়ক কোন বিষয় সংঘটিত হলে সে জন্য প্রতিশোধমুলক ব্যবস্থা না নিয়ে বরং ক্ষমা প্রদর্শন করা এবং সদয় ব্যবহার করা । তৃতীয়তঃ তাদের পদস্খলন ও ভুলভ্রান্তির কারণে তাদের কল্যাণ কামনা থেকে বিরত না থাকা । তাদের জন্য দো'আ-প্রার্থনা করতে থাকা এবং বাহ্যিক আচার আচরণে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার পরিহার না করা । উল্লেখিত আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথমে তো সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারপর আচরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে হেদায়াত দেয়া হয়েছে । পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের দু'জায়গায় সরাসরি নির্দেশ দান করেছেন । একটি হলো এই আয়াতে এবং দ্বিতীয়টি হলো সূরা আশ্-শূরার সে আয়াতে যাতে সত্যিকার মুসলিমদের গুণবৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি গুণ এই বলা হয়েছে যে, "(যারা সত্যিকার মুসলিম) তাদের প্রতিটি কাজ হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে" । এতদুভয় আয়াতে যেভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শের অপরিহার্যতা প্রতীয়মান হয়, তেমনিভাবে এতে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিধান সংক্রান্ত কয়েকটি মূলনীতিও সামনে এসে যায় । তা হলো এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র হলো পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র যাতে পরামর্শের ভিত্তিতে নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে থাকে । এমনকি আলোচনা ও পরামর্শ করাকে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি মৌলিক বিষয় হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে ।

(১) উল্লেখিত আয়াতে লক্ষণীয় যে, এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়ার পর বলা হয়েছে "পরামর্শ করার পর আপনি যখন কোন একটি দিক সাব্যস্ত করে নিয়ে সেমতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন" । এতে নির্দেশ বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্প হওয়াকে শুধুমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিই সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে । অর্থাৎ 'আযামতুম' বলা হয়নি, যাতে সংকল্প ও তা বাস্তবায়নে সাহাবায়ে কেরামের সংযুক্ততাও বুঝা যেতে পারত । এই ইঙ্গিতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরামর্শ করে নেয়ার পর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমীর যা করবেন তাই হবে গ্রহণযোগ্য । কোন কোন সময় উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে যদি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের অভিমত বেশী শক্তিশালী হত, তখন সেমতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন । অথচ পরামর্শ সভায় অধিকাংশ সময় এমনসব মনীষী উপস্থিত

উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন।

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী হবার কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? সুতরাং মুমিনগণ আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করুক।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

১৬১. আর কোন নবী 'গলুল'(১) (অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন) করবে, এটা অসম্ভব। এবং কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কেয়ামতের দিন সে তা সাথে নিয়ে আসবে(২)। তারপর

থাকতেন, যারা ইবন আব্বাসের তুলনায় বয়স, জ্ঞান ও সংখ্যার দিক দিয়ে ছিলেন গরিষ্ঠ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামও অনেক সময় 'শায়খাইন' অর্থাৎ আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এবং উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর মতকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীদের মতের উপর প্রধান্য দান করেছেন। এমন কি এমন ধারণাও করা হতে লাগল যে, উল্লেখিত আয়াতটি এতদুভয়ের সাথে পরামর্শ করার জন্যই নাযিল হয়ে থাকবে। মোটকথা: সর্বাবস্থায় সংখ্যাগরিষ্টের মতই গ্রহণ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা ইসলামে নেই। বরং এখানে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার কাছাকাছি যা হবে তা-ই হবে গ্রহণযোগ্য।

(১) গলুলের এক অর্থ হয় খেয়ানত করা, জোর করে দখল করে নেয়া। সে হিসেবেই এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্র নিকট বড় গলুল তথা খেয়ানত হল এক বিঘত যমীন নেয়া। তোমরা দু'জন লোককে কোন যমীনের বা ঘরের প্রতিবেশী দেখতে পাবে। তারপর তাদের একজন তার সাথীর অংশের এক বিঘত যমীন কেটে নেয়। যদি কেউ এভাবে যমীন কেটে নেয় সে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সাত যমীন গলায় পেঁচিয়ে থাকবে। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৪১]

(২) 'গলুল' এর অন্য অর্থ সরকারী সম্পত্তি থেকে কোন কিছু গোপন করা। গনীমতের মালও সরকারী সম্পদ। সুতরাং তা থেকে চুরি করা মহাপাপ। কোন নবীর পক্ষে এমন পাপের সম্ভাব্যতা নেই। আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল

প্রত্যেককে, যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না[১]।

হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গনীমতের মাল চুরি করার বিষয়টিও এসে গেছে। ঘটনাটি ছিল এই যে, বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মালের মধ্যে থেকে একটি চাদর খোয়া যায়। কোন কোন লোক বলল, হয়ত সেটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে থাকবেন। [তিরমিযীঃ ৩০০৯, আবুদাউদঃ ৩৯৭১] এসব কথা যারা বলত তারা যদি মুনাফেক হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই। আর তা কোন অবুঝ মুসলমানের পক্ষে বলাও অসম্ভব নয়। তবে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, সে হয়ত মনে করে থাকবে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে غلول বা গনীমতের মালের ব্যাপারে অনধিকার চর্চার ভয়াবহতা এবং কেয়ামতের দিন সে জন্য কঠিন শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, কোন নবী সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, তিনিই এহেন পাপ কাজ করে থাকবেন, একান্তই অনর্থক ধৃষ্টতা। কারণ, নবীগণ যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত।

(১) এখানে একটা বিষয় জানা আবশ্যক যে, গনীমতের মাল চুরি করা কিংবা তাতে খেয়ানত করা বা সরকারী সম্পদ থেকে কোন কিছু আত্মসাৎ করা, সাধারণ চুরি অথবা খেয়ানত অপেক্ষা বেশী পাপের কাজ। কারণ, এ সম্পদের সাথে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে লোক এতে চুরি করবে, সে চুরি করবে শত-সহস্র লোকের সম্পদ। যদি কখনো কোন সময় তার মনে তা সংশোধন করার খেয়াল হয়, তখন সবাইকে তাদের অধিকার প্রত্যার্পন করা কিংবা সবার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়া একান্তই দুরূহ ব্যাপার। পক্ষান্তরে অন্যান্য চুরি মালের মালিক সাধারণতঃ পরিচিত ও নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কখনও কোন সময় আল্লাহ্ যদি তওবাহ্ করার তাওফীক দান করেন, তবে তার হক আদায় করে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিয়ে মুক্ত হতে পারে। সে কারণেই কোন এক যুদ্ধে এক লোক যখন কিছু পশম নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, গনীমতের মাল বন্টন করার কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন তার মনে হল, 'তখন সেগুলো নিয়ে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে উপস্থিত হল। তিনি রহমাতুললিল আলামীন এবং উম্মতের জন্য পিতা-মাতা অপেক্ষা সদয় হওয়া সত্ত্বেও তাকে এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, এখন এগুলো কেমন করে আমি সমস্ত সেনাবাহিনীর মাঝে বন্টন করব? কাজেই কেয়ামতের দিনই তুমি এগুলো নিয়ে উপস্থিত হয়ো। [সহীহ্ ইবনে হিব্বানঃ ৪৮৫৮, মুসনাদে আহমাদঃ ২/২১৩, ৬/৪২৮] তাছাড়া গনীমতের মাল বা সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করার ব্যাপারটি অন্যান্য চুরি অপেক্ষা কঠিন পাপ হওয়ার আরও একটি কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে যেখানে সমগ্র সৃষ্টি সমবেত হবে, সবার

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

১৬২. আল্লাহ্ যেটাতে সন্তুষ্ট, যে তারই অনুসরণ করে, সে কি ওর মত যে আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নামই যার আবাস? আর সেটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

সামনে তাকে সেখানে এমনভাবে লাঞ্ছিত করা হবে যে, চুরি করা বস্তু-সামগ্রী তার কাঁধে চাপানো থাকবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "দেখ, কেয়ামতের দিন কারো কাঁধে একটি উট চাপানো অবস্থায় থাকবে এবং ঘোষণা করা হবে যে, এ লোক গনীমতের মালের উট চুরি করেছিল, এমন যেন না হয়। যদি সে লোক আমার শাফা'আত কামনা করে, তবে আমি তাকে পরিস্কার ভাষায় জবাব দিয়ে দেব যে, আমি আল্লাহ্র যা কিছু নির্দেশ পেয়েছিলাম, তা সবই পৌঁছে দিয়েছিলাম, এখন আমি কিছুই করতে পারব না"। [বুখারীঃ ৩০৭৩] মনে রাখা আবশ্যক যে, মসজিদ, মাদ্রাসা এবং ওয়াকফের মালের অবস্থাও একই রকম, যাতে হাজার-হাজার মুসলিমের চাঁদা বা দান অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমাও যদি করাতে হয়, তবে কার কাছ থেকে ক্ষমা করাবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্ত হাদীয়া বা উপঢৌকণ গলুলের শামিল'। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪২৪] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ইবনুল্লতুবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ দেন। সে ফিরে এসে বললঃ এগুলো তোমাদের আর এগুলো আমাকে হাদীয়া দেয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ 'কি হলো কর্মচারীর তাকে আমরা কোন কাজে পাঠাই পরে সে এসে বলে, এগুলো তোমাদের আর ওগুলো আমাকে হাদীয়া দেয়া হয়েছে। সে কেন তার পিতা-মাতার ঘরে বসে দেখে না তার জন্য হাদীয়া আসে কি না? যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার শপথ করে বলছি, যে কেউ এর থেকে কিছু নিবে কিয়ামতের দিন সেটাই সে তার কাঁধে নিয়ে আসবে'। [বুখারীঃ ৬৯৭৯, মুসলিমঃ ১৮৩২] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ 'হে মানুষ সকল! তোমাদের কাউকে কোন কাজে লাগালে যদি সে আমাদের থেকে কিছু লুকায় তবে সে তা কেয়ামতের দিন সাথে নিয়ে আসবে' [মুসলিমঃ ১৮৩৩] আবদুল্লাহ ইবন আমর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিনিসপত্রের দায়িত্বে এক লোক ছিল, তাকে 'কারকারাহ' বলা হতো, হঠাৎ করে সে মারা গেল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে তো জাহান্নামে গেছে। লোকেরা তার জিনিসপত্র তল্লাশী করে দেখতে পেল যে, সে একটি জামা চুরি করেছে।" [বুখারীঃ ৩০৭৪]

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. আল্লাহ্‌র কাছে তারা বিভিন্ন স্তরের; তারা যা করে আল্লাহ্ সেসব ভালভাবে দেখেন।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা আগে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল(১)।

اَوَلَمَّاۤ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. কি ব্যাপার! যখন তোমাদের উপর মুসীবত আসলো (ওহুদের যুদ্ধে) তখন তোমরা বললে, 'এটা কোত্থেকে আসলো?' অথচ তোমরাতো দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে (বদরের যুদ্ধে)। বলুন,

(১) এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয় সূরা আল-বাক্বারার ১২৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ আয়াতে একটি শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো, ﴿لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ এ প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরআনুল কারীমের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের জন্য সবচাইতে বড় নেয়ামত ও মহাঅনুগ্রহ। কিন্তু এখানে এই আয়াতে শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট করাটা কুরআনের অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে কুরআন সমগ্র বিশ্বের জন্য হেদায়াত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত থাকা সত্ত্বেও ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ﴾ বা 'মুত্তাকীনদের জন্য হেদায়াত" বলারই অনুরূপ যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে মুত্তাকীনদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই এক। তা হল এই যে, যদিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্তিত্ব মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের জন্যই মহা নেয়ামত এবং বিরাট অনুগ্রহ, তেমনিভাবে কুরআনুল কারীমও সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য হেদায়াত, কিন্তু যেহেতু এই হেদায়াত ও নেয়ামতের ফল শুধু মুমিন-মুত্তাকীরাই উপভোগ করছে, সেহেতু কোন কোন স্থানে একে তাদেরই সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

'এটা তোমাদের নিজেদেরই[১] কাছ থেকে'[২]; নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. আর যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা আল্লাহ্রই হুকুমে[৩]; আর যাতে তিনি প্রকাশ করেন, কে তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মুমিন।

وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ ۖ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ قَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا۟ ۖ قَالُوا۟ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا ٱتَّبَعْنَٰكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَٰنِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. আর মুনাফেকদের প্রকাশ করার জন্য। আর তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'এস, তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর।' তারা বলেছিল, 'যদি যুদ্ধ জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম।' সেদিন

(১) এক হাদীসে উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বদরের ঘটনা বর্ণনার পর উহুদের যুদ্ধের বিপর্যয়ের কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এটার কারণ হলোঃ বদরের যুদ্ধের বন্দীদের থেকে ফিদিয়া নেয়া। [দেখুনঃ মুসনাদে আহমাদঃ ১/২০৭]

(২) সহীহ আকীদা বিশ্বাস হলো, কোন খারাপের সম্পর্ক আল্লাহ্র দিকে করা জায়েয নেই। আল্লাহ্ তা'আলার দিকে সব সময় ভাল ফলাফলের সম্পর্ক করতে হয়। খারাপ ফলের ব্যহ্যিক কারণ সৃষ্ট জীব। খারাপ তাদেরই অর্জন করা। আর এজন্যই সূরা আল-জ্বিনে আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিনদের কথা উল্লেখ করে বলছেন যে, তারা বলেছিল "আর আমরা জানিনা যমীনের অধিবাসীদের জন্য খারাপ কিছুর ইচ্ছা করা হয়েছে নাকি তাদের প্রভূ তাদের জন্য সঠিক পথ দেয়ার ইচ্ছা করেছেন"। [সূরা জ্বিনঃ ১০] অন্য হাদীসে এসেছে, 'আর খারাপ কিছু আপনার থেকে হয় না' [মুসলিমঃ ৭৭১]

(৩) এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব যা কিছু হয়েছে, সবই আল্লাহ্র ইচ্ছা ও সমর্থনে হয়েছে। মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা বা অনুমতি দু'প্রকার। এক. 'ইযনে শার'য়ী' বা শরী'আতগত অনুমোদন বা ইচ্ছা। এ অনুমোদনের সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সম্পর্ক রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক কাউকে সালাত আদায় করতে দেয়ার ইচ্ছা, কাউকে হক পথে চলতে দেয়ার ইচ্ছা ইত্যাদি। এ ধরনের অনুমোদন বা ইচ্ছা সংঘটিত হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। দুই. 'ইযনে কাওনী' বা প্রকৃতিগত অনুমোদন বা ইচ্ছা। এ অনুমোদনের সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নেই। তবে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। যেমন এ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্র অনুমোদন বা ইচ্ছা। [তাফসীরে সা'দী]

তারা ঈমানের চেয়ে কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা তা মুখে বলে এবং তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা অধিক অবগত।

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. যারা ঘরে বসে রইল এবং তাদের ভাইদের প্রতি বলল যে, তারা তাদের কথামত চললে নিহত হত না। তাদেরকে বলুন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর।'

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনোই মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত এবং তাদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত(১)।

(১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ আমরা এ আয়াত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ 'শহীদদের আত্মাকে সবুজ পাখির পেটে রাখা হয়। আরশের সাথে লটকানো ঝাড়বাতির সাথে যেগুলো অবস্থিত। জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা তারা সেখানে বিচরণ করতে পারে। তাদের প্রভু তাদের দিকে একবার তাকিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা কি কিছু চাও? তারা বললঃ আমাদের আর কি চাহিদা থাকতে পারে? আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারি? এভাবে তিনবার তিনি তাদের তা জিজ্ঞাসা করলেন। এরপর যখন শহীদগণ বুঝতে পারল যে, তাদেরকে চাইতেই হবে, তখন তারা বললঃ হে রব! আমরা চাই আমাদের আত্মাকে আমাদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হোক যাতে আমরা আবার আপনার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। তারপর আল্লাহ্ যখন দেখলেন যে, তাদের এর দরকার নেই তখন তাদের এভাবেই ছেড়ে দিলেন। [মুসলিমঃ ১৮৮৭]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত হলে বললেনঃ 'জাবের, তোমার কি হল, তোমার মন খারাপ দেখছি? আমি বললামঃ ওহুদের যুদ্ধে আমার বাবা শহীদ হয়ে গেলেন। তার পরিবার এবং অনেক ঋণ রেখে গেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাকে কি আমি তোমার বাবার সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে সাক্ষাত করেছেন সে সুসংবাদ দেব? আমি বললামঃ অবশ্যই হে আল্লাহ্র রাসূল। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝١٧٠

১৭০. আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝١٧١

১৭১. তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহ্র নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য এবং এজন্য যে আল্লাহ্ মুমিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না(১)।

আঠারতম রুকূ'

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝١٧٢

১৭২. যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে(২)। তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের

সবার সাথে কথা বলেন পর্দার আড়াল থেকে। কিন্তু তোমার বাবাকে আল্লাহ্ জীবিত করে সরাসরি কথা বলেছেন এবং বলেছেন, "হে আমার বান্দা, আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব।" তিনি বললেনঃ হে আমার রব, আমাকে জীবিত করে দিন যাতে আমি আবার আপনার রাস্তায় শহীদ হতে পারি। মহান আল্লাহ্ বললেনঃ "আমার পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত এই যে, এরা দুনিয়াতে পুনরায় ফিরে যাবে না।" জাবের বলেনঃ তখন এই আয়াত নাযিল হয়।' [তিরমিযীঃ ৩০১০, ইবনে মাজাহ্ঃ ১৯০, ২৮০০] ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন, শহীদদের অবস্থা ও মর্যাদার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। কাজেই বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা এসেছে।

(১) আয়াতটির অন্য অনুবাদ হচ্ছে, "তারা আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহ্র নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না"। উভয় অনুবাদই শুদ্ধ। তবে তাবারী উপরোক্ত অনুবাদটি প্রাধান্য দিয়েছেন।

(২) উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেনঃ আমাকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেছেন, তোমার পিতা ও আমার পিতা ঐ সমস্ত সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা যখমী হওয়ার পরে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। [বুখারীঃ ৪০৭৭] অর্থাৎ যুবাইর ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা।

জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে[১]।

১৭৩. এদেরকে লোকেরা বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জড়ো হয়েছে, কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক'[২]!

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

(১) এ যুদ্ধের ঘটনাটি এই যে, মক্কার কাফেররা যখন ওহুদের ময়দান থেকে ফিরে এল, তখন পথে এসে তাদের আফসোস হলো যে, আমরা বিজয় অর্জন করার পরিবর্তে অনর্থকই ফিরে এলাম। সবাই মিলে একটা কঠিন আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত মুসলিমকে খতম করে দেয়াই উচিৎ ছিল। আর এই কল্পনা তাদের মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল যে, পুনরায় মদীনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তাতে তারা সোজা মক্কার পথ ধরল। কিন্তু যেতে যেতে মদীনাযাত্রী কোন পথিকের কাছে বলে দিয়ে গেল যে, তোমরা সেখানে গিয়ে কোন প্রকারে মুসলিমদের মনে আমাদের ভয় বিস্তার করবে যে, তারা এদিকে ফিরে আসছে। এ ব্যাপারটি ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন। কাজেই তিনি 'হামরাউল-আসাদ' পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন, কে আছে, যারা মুশরেকদের পশ্চাদ্ধাবন করবে? তখন সত্তর জন সাহাবী প্রস্তুত হলেন যাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যারা গত কালকের যুদ্ধে কঠিন ভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্যে চলাফেরা করছিলেন। এরাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হলেন। [বুখারী: ৪০৭৭]

(২) যখন সাহাবায়ে কিরাম 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন, তখন সেখানে নু'আইম ইবনে মাস'উদের সাথে সাক্ষাত হল। সে সংবাদ দিল যে, আবু সুফিয়ান নিজের সাথে আরও সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় মদীনা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আহত-দুর্বল সাহাবায়ে কেরাম এই ভীতিজনক সংবাদ শুনে সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা তা জানি না 'আল্লাহ্ আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী'। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই আমাদের জন্য উত্তম যিম্মাদার'। এ কথাটি ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ۝

১৭৪. তারপর তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ্ যাতে সন্তুষ্ট তারা তারই অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল(১)।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاۗءَهٗ ۠ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৭৫. সে(২) তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; কাজেই যদি তোমরা মুমিন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـــًٔا ۭ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي

১৭৬. যারা কুফরীতে দ্রুতগামী, তাদের আচরণ যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। তারা কখনো আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি

বলেছিলেন। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাই বলেছিলেন, যখন লোকজন তাকে এসে খবর দিলো যে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদেরকে ভয় করো। এ কথা শুনে তাদের ঈমান আরো মজবূত হলো, তারা বললঃ আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর আমাদের পক্ষ থেকে কাজের জন্য তিনিই উত্তম যিম্মাদার। [বুখারীঃ ৪৫৬৩]

(১) এ আয়াতে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জেহাদের জন্য রওয়ানা হওয়া এবং 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' বলার উপকারিতা, ফলশ্রুতি ও বরকত বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে- "এরা আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এল। তাতে তাদের কোন রকম অনিষ্ট হলো না আর তারা হল আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অনুগত।" আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তিনটি নেয়ামত প্রদান করলেন। প্রথম নেয়ামত হলো এই যে, কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, এতে তারা পালিয়ে গেল। ফলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিরাপদ রইলেন। এ নেয়ামতকে আল্লাহ্ তা'আলা 'নেয়ামত' শব্দেই উল্লেখ করলেন। দ্বিতীয় নেয়ামত এই যে, হামরাউল আসাদের বাজারে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সুযোগ হয়েছিল এবং তাতে তারা যে লাভবান হয়েছিলেন এবং কাফেরদের ফেলে যাওয়া গণীমতের মাল থেকে তারা যে লাভবান হয়েছিলেন তাকেই বলা হয়েছে 'ফযল'। তৃতীয় নেয়ামতটি হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ যা সমস্ত নেয়ামতের ঊর্ধ্বে এবং যা এই জেহাদে তাদেরকে বিশেষ ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে।

(২) এখানে 'সে' বলতে তাকে বোঝানো হয়েছে, যে ব্যক্তি মুমিনদের কাছে এসে বলেছিল যে, 'তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষ জড়ো হয়েছে কাজেই তোমরা তাদের ভয় করো'। তারা ছিল বনী আব্দুল কায়েসের কিছু লোক। [তাবারী]

করতে পারবে না। আল্লাহ্ আখেরাতে তাদেরকে কোন অংশ দেবার ইচ্ছা করেন না। আর তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে(১)।

الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

১৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করেছে তারা কখনো আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

১৭৮. কাফেরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমরা অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য; আমরা অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়(২)।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۚ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

(১) এক্ষেত্রে কেউ যেন এমন কোন সন্দেহ না করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদিগকে অবকাশ, দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য-সামর্থ্য ও আরাম-আয়েশের উপকরণ এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে তারা নিজেদের অপরাধ প্রবণতায় অধিকতর এগিয়ে যায়, তাহলে তো কাফেররা নির্দোষ। কারণ, আয়াতের উদ্দেশ্য হল এই যে, কাফেরদের সামান্য কয়েক দিনের এ অবকাশ ও ভোগ -বিলাসে যেন মুসলিমরা পেরেশান না হয়। কেননা, কুফর ও পাপ সত্বেও তাদেরকে পার্থিব শক্তি-সামর্থ্য ও বৈভব দান করাটাও তাদের শাস্তিরই একটি পন্থা, যার অনুভূতি আজকে নয় এই পৃথিবী থেকে যাবার পরই হবে যে, তাদেরকে দেয়া পার্থিব ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ তারা পাপকর্মে ব্যয় করেছে প্রকৃতপক্ষে সেসবই ছিল জাহান্নামের অঙ্গার। এ বিষয়টিই কতিপয় আয়াতে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন। বলা হয়েছে, "কাফেরদের ধন-সম্পদ এবং ভোগ-বিলাস তাদের জন্য গৌরবের বস্তু নয়; এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাবেরই একটি কিস্তি যা আখেরাতে তাদের আযাব বৃদ্ধির কারণ হবে"। [সূরা আত-তাওবাহ: ৫৫]

(২) এ আয়াতে কাফেরদেরকে কেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাপের কারণে শাস্তি না দিয়ে অবকাশ দিয়ে থাকেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, তাদের এ অবকাশ তাদের জন্য মঙ্গল বা সুখকর নয়। এটা তাদের গোনাহ আরও বর্ধিত করে তাদেরকে ভালভাবে পাকড়াও করার জন্য। অন্য আয়াতে অবশ্য বলা হয়েছে যে, তাদেরকে এ অবকাশ প্রদানের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা দুঃখ-কষ্ট দিয়ে আল্লাহ্র দিকে ফিরানোর সুযোগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তারপরও যারা অবাধ্যতা অবলম্বন করে তাদেরকে তিনি শক্তহাতে পাকড়াও করেন। আল্লাহ্ বলেন, "আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে সেখানকার অধিবাসীদেরকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করি,

আর তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ।

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

১৭৯. অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ্ মুমিনগণকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না । অনুরূপভাবে গায়েব সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা আল্লাহ্র নিয়ম নয়; তবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন(১) । কাজেই তোমরা

যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে । তারপর আমরা অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি । অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো দুঃখ-সুখ ভোগ করেছে ।' তারপর হঠাৎ তাদেরকে আমরা পাকড়াও করি, কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে পারে না" [সূরা আল-আ'রাফ: ৯৪-৯৫] আরও বলেন, "আপনার আগেও আমরা বহু জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি; তারপর তাদেরকে অর্থসংকট ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পীড়িত করেছি, যাতে তারা বিনীত হয় । আমাদের শাস্তি তাদের উপর যখন আপতিত হল তখন তারা কেন বিনীত হল না? কিন্তু তাদের হৃদয় কঠিন হয়েছিল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল । তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমরা তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম; অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা তাতে উল্লাসিত হল তখন হঠাৎ তাদেরকে ধরলাম; ফলে তখনি তারা নিরাশ হল" [সূরা আল-আন'আম: ৪২-৪৪] অন্য আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, এ অবকাশ প্রদান তাঁর মজবুত কৌশলের অন্তর্গত । আল্লাহ্ বলেন: "আর যারা আমাদের নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে আমরা তাদেরকে এমনভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাই যে, তারা জানতেও পারবে না । আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি; আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ ।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৮২-১৮৩] আরও বলেন, "অতএব ছেড়ে দিন আমাকে এবং যারা এ বাণীতে মিথ্যারোপ করে তাদেরকে, আমরা তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরব এমনভাবে যে, তারা জানতে পারবে না । আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ ।" [সূরা আল-কালাম: ৪৪-৪৫]

(১) অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করেন না । কিন্তু নবী-রাসূলদের যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে কিছু কিছু গায়েবী বিষয়ের জ্ঞান দান করেন । যাতে তারা এর মাধ্যমে আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রচার করতে সমর্থ হন । যেমন, মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তার রাসূলকে কিছু কিছু

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান আন। তোমরা ঈমান আনলে ও তাক্ওয়া অবলম্বন করে চললে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রয়েছে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۭ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ١٨٠

১৮০. আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল, এমনটি যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গল। যেটাতে তারা কৃপণতা করবে কেয়ামতের দিন সেটাই তাদের গলায় বেড়ী হবে(১)। আসমান ও যমীনের সত্ত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্রই। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।

ঊনিষতম রুকূ'

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاۗءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ

১৮১. আল্লাহ্ শুনেছেন তাদের কথা যারা বলে, 'আল্লাহ্ অবশ্যই অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত'(২)। তারা

গায়েবী জ্ঞান দান করেছিলেন এবং তাদের ব্যাপারে সাবধান করেছিলেন। [আল-মুইয়াসসার] সুতরাং তোমাদের কাজ হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করা। গায়েবী সংবাদ জানার জন্য বসে থাকা তোমাদের কাজ নয়। যদি প্রকৃত ঈমান ও তাকওয়া তোমাদের অর্জিত হয়, তবে এতেই তোমাদের সাফল্য রয়েছে।

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করেনি, তার সে ধন-সম্পদকে কেয়ামতের দিন একটি সাপের রূপ দেয়া হবে। যার মাথায় চুল থাকবে এবং চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। সাপটিকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে, সেটি তার মুখে দংশন করতে থাকবে এবং বলবেঃ আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার গচ্ছিত অর্থসম্পদ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি পাঠ করেন। [বুখারীঃ ৪৫৬৫]

(২) এ আয়াতে ইয়াহূদীদের একটি কঠিন ঔদ্ধত্যের ব্যাপারে সতর্কীকরণ ও শাস্তির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তা এরূপ যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন

الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨١﴾

যা বলেছে তা এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমরা লিখে রাখব এবং বলব, 'তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর(১)।'

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٢﴾

১৮২. এ হচ্ছে তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি মোটেই যালেম নন।

কুরআনে হাকীম থেকে যাকাত ও সদকার বিধি-বিধান বর্ণনা করেন, তখন উদ্ধত ইয়াহূদীরা বলতে আরম্ভ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফকীর ও গরীব হয়ে গেছেন, আর আমরা হচ্ছি ধনী ও আমীর। সে জন্যেই তো তিনি আমাদের কাছে চাইছেন। [তাবরী] মূলত: যে ব্যক্তি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক বলে জানে, তার মনে সাদকা ও কর্জ শব্দ ব্যবহারে কস্মিনকালেও এমন কোন সন্দেহ উদয় হতে পারে না, যেমনটি উদ্ধত ইয়াহূদীদের উক্তিতে বিদ্যমান। কাজেই কুরআনুল কারীম এই সন্দেহের উত্তর দান করেছে। শুধুমাত্র তাদের ঔদ্ধত্য ও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের প্রতি মিথ্যারোপ এবং তার প্রতি উপহাস করার একাধিক অপরাধের শাস্তি হিসাবে বলা হয়েছে, আমি তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তিসমূহ লিখে রাখব যাতে কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করে আযাবের ব্যবস্থা করা যায়। অন্যথায় আল্লাহ্র জন্য লেখার কোনই প্রয়োজন নেই। অতঃপর ইয়াহূদীদের এ সমস্ত ঔদ্ধত্যের আলোচনার সাথে সাথে তাদের আরও একটি অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরা হলো এমন লোক, যারা নবী-রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কিংবা তাদের উপহাস করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এরা তাদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। কাজেই এমন লোকদের দ্বারা কোন নবীর প্রতি মিথ্যারোপ ও উপহাস করা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। [মা'আরিফুল কুরআন]

(১) এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআনের লক্ষ্য হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মদীনাবাসী ইয়াহূদীবর্গ। আর নবীদের হত্যার ঘটনাটি হল ইয়াহইয়া ও যাকারিয়্যা আলাইহিমাস্ সালামের সময়ের। সুতরাং এ আয়াতে নবী হত্যার অপরাধ এ সময়ের ইয়াহূদীদের উপর আরোপ করা হল কেমন করে? তার কারণ এই যে, মদীনার ইয়াহূদীরাও তাদের পূর্ববর্তী ইয়াহূদীদের সে কাজের ব্যাপারে সম্মত এবং আনন্দিত ছিল বলে তারাও সেই হত্যাকারীদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। মূলতঃ এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কুফরের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপনও কুফরী ও মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতের শেষাংশে এবং পরবর্তী আয়াতে সে উদ্ধতদের শাস্তিস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করে বলা হবে, 'এবার আগুনে জ্বলার স্বাদ আস্বাদন কর, যা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল; আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এটা কোন অন্যায় আচরণ নয়'।

الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ۭ قُلْ قَدْ جَاۗءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

১৮৩. যারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি ঈমান না আনি যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের কাছে এমন কুরবানী উপস্থিত না করবে যা আগুন খেয়ে ফেলবে। তাদেরকে বলুন, 'আমার আগে অনেক রাসূল স্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তোমরা যা বলছ তা সহ তোমাদের কাছে এসেছিলেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে?'

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاۗءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝

১৮৪. তারা যদি আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, আপনার আগে যে সব রাসূল স্পষ্ট নিদর্শন, আসমানী সহীফা এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিলেন তাদের প্রতিও তো মিথ্যারোপ করা হয়েছিল।

كُلُّ نَفْسٍ ذَاۗىِٕقَةُ الْمَوْتِ ۭ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۭ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

১৮৫. জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেবলমাত্র কেয়ামতের দিনই তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে। অতঃপর যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলকাম(১)। আর পার্থিব

(১) পৃথিবীর এমন কোন মানুষ নেই যে সফলতা চায় না। এ সফলতা একেকজন একেক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ধারণ করে। কেউ দুনিয়ার প্রচুর সম্পদ, নারী, গাড়ী-বাড়ী, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নির্ধারণ করে। কেউ আবার সুস্বাস্থ্যকে নির্ধারণ করে। কেউ আবার অন্যকিছু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের সফলতা কিসে তা আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে বলে দিয়েছেন। তিনি বলছেন যে, যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে সেই সফলকাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতে এক বেত পরিমান জায়গা দুনিয়া ও তাতে যা আছে তার থেকে উত্তম"। তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন। [তিরমিযী: ৩০১৩]

জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছু নয়[১]।

لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۫ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ۭ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

১৮৬. তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবনে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের কাছ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ[২]।

(১) এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর আখেরাতে নিজের কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি প্রাপ্ত হবে, যা কঠিনও হবে আবার দীর্ঘও হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের পক্ষে সে চিন্তা করাই উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সে লোকই সত্যিকার কৃতকার্য, যে জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে। তা প্রাথমিক পর্যায় হোক- যেমন, সৎকর্মশীল আবেদগণের সাথে যেরূপ আচরণ করা হবে- অথবা কিছু শাস্তি ভোগের পরেই হোক- যেমন, পাপী মুসলিমদের অবস্থা। কিন্তু সমস্ত মুসলিমই শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি লাভ করে অনন্ত কালের জন্য জান্নাতের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে কাফেরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কাজেই তারা যদি সামান্য কয়েকদিনের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে গর্বিত হয়ে ওঠে, তবে সেটা একান্তই ধোঁকা। সেজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে "দুনিয়ার জীবন তো হলো ধোঁকার উপকরণ।" তার কারণ এই যে, সাধারণতঃ এখানকার ভোগ-বিলাসই হবে আখেরাতের কঠিন যন্ত্রণার কারণ। পক্ষান্তরে এখানকার দুঃখ-কষ্ট হবে আখেরাতের সঞ্চয়।

(২) এ আয়াতে মুসলিমদেরকে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনের জন্য জান-মালের কুরবানী দিতে হবে এবং কাফের, মুশরিক ও আহলে কিতাবদের কটুক্তি এবং কষ্ট দানের কারণে ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। এ সমস্তই হলো তাদের জন্য পরীক্ষা। এতে ধৈর্য ধারণ করা এবং নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাকওয়ার পরাকাষ্ঠা সাধনে নিয়োজিত থাকাই হল তাদের কর্তব্য। উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাধায় চড়ে আমাকে পেছনে বসিয়ে সা'দ ইবনে উবাদাকে দেখতে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের বৈঠকখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনো সে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়নি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭. স্মরণ করুন, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন: 'অবশ্যই তোমরা তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।' এরপরও তারা তা তাদের পেছনে ফেলে রাখে (অগ্রাহ্য করে) ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে; কাজেই তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট!

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَّيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

১৮৮. যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং নিজেরা যা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালবাসে(১), তারা শাস্তি থেকে মুক্তি

ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। এমতাবস্থায় সে তার নাকে কাপড় দিয়ে বলল, আমাদেরকে আমাদের বৈঠকখানায় কষ্ট দিও না। যে তোমার কাছে যায় তাকে তোমার কথা শোনাও। এতে মুসলিম, মুশরিক ও ইয়াহূদীদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক কষ্টে তাদের ঝগড়া থামিয়ে সা'দ ইবনে উবাদার কাছে গিয়ে ঘটনাটা জানালেন। সা'দ ইবনে উবাদা বললেন, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, আল্লাহ্ আপনাকে সত্যদ্বীনসহ পাঠিয়েছেন। কিন্তু এ লোকগুলো আপনার আসার পূর্বেই ঐ লোকটাকে নেতা বানাতে চেয়েছিল। আপনার আগমনের পর সে কিছু না পাওয়াতে তার মানসিক অবস্থা খারাপ হওয়াতে সে এসব কথা বলছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীরা কাফেরদেরকে এমনিতেও ক্ষমা করে দিতেন। এভাবে তাদের কষ্ট সহ্য করে তিনি বদর যুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে। [বুখারীঃ ৪৫৬৬] অন্য বর্ণনায় এসেছে, কা'ব ইবনে আশরাফ ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদনামী করে বেড়াত এবং কবিতার মাধ্যমে কাফেরদেরকে রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী করে তুলত। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসলেন সেখানে বিভিন্ন ধরনের লোক পেলেন। তাদের সাথে তিনি একটি সন্ধিতে আসার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মুশরিক ও ইয়াহূদীরা তাঁকে এবং সাহাবাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে আরম্ভ করল। তখন এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধৈর্য ধারনের নির্দেশ দিলেন। [আবু দাউদঃ ৩০০০]

(১) আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

পাবে- এরূপ আপনি কখনো মনে করবেন না। আর তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১৮৯. আর আসমান ও যমীনের সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্‌রই; আর আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

বিশতম রুকূ'

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ۝

১৯০. আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে(১), রাত ও দিনের পরিবর্তনে(২) নিদর্শনাবলী

ওয়াসাল্লামের যুগে কিছু মুনাফেক তাঁর সাথে যুদ্ধে যাওয়া থেকে পিছপা হত। এতে তারা নিজেদের মধ্যে আনন্দবোধ করত। তারপর যখন রাসূল ফিরে আসতেন, তখন তাঁর কাছে ওযর পেশ করত এবং অন্যান্যভাবে নিজেদের প্রশংসা শুনতে চাইত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [বুখারীঃ ৪৫৬৭; মুসলিমঃ ২৭৭৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, মারওয়ান ইবনে হাকাম তার দারওয়ানকে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের কাছে পাঠিয়ে বললেনঃ যদি কোন লোক কোন কাজ না করেও প্রশংসা পেতে ভালবাসার কারণে শাস্তিযোগ্য হয়, তাহলে আমরা সবাইতো শাস্তি পাব। তখন ইবনে আব্বাস বললেনঃ তোমার আর এ আয়াতের মধ্যে কি সম্পর্ক? এ আয়াতের ঘটনা হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহূদী আলেমদেরকে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার কারণে তারা সঠিক জবাব গোপন করে ভিন্ন জবাব দিয়ে রাসূলের প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টা করল। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়। [বুখারীঃ ৪৫৬৮; মুসলিমঃ ২৭৭৮]

(১) অর্থাৎ আসমান এবং যমীন সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান। এ দুয়ের মধ্যে অবস্থিত আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টিরাজিকেও এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এ বিরাট সৃষ্টজগতের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই স্ব স্ব সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনরূপে দাঁড়িয়ে আছে।

(২) চিন্তা-ভাবনার দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, দিন-রাত্রির আবর্তন। আয়াতে উল্লেখিত اختلاف শব্দটি আরবী পরিভাষায়, 'পরে আসা' এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেমতে বাক্যের অর্থ হবে, রাত্রির গমন এবং দিবসের আগমন। আবার اختلاف শব্দ দ্বারা কম-বেশীও বুঝায়। যেমন, শীতকালে রাত্রি হয় দীর্ঘ এবং দিন হয় খাটো, গরমকালে দিন বড় এবং রাত্রি হয় ছোট। অনুরূপভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে দিবস এবং রাত্রির দৈর্ঘ্যেও তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন, উত্তর মেরুর সন্নিকটবর্তী দেশগুলোতে দিবাভাগ উত্তর মেরু থেকে দুরবর্তী দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশী দীর্ঘ হয়। এসব বিষয়ই আল্লাহ্ তা'আলার অপার কুদরাতের অতি উজ্জ্বল নিদর্শন।

রয়েছে[১] বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য।

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

১৯১. যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে, আর বলে, 'হে আমাদের রব! আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি[২],

(১) آية এর বহুবচন হল آيات। শব্দটি কয়েকটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যথা- মু'জিযাকে 'আয়াত' বলা হয়। অনুরূপভাবে, কুরআনের বাক্যকেও 'আয়াত' বলা হয়। তৃতীয় অর্থে দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীকে বুঝানো হয়ে থাকে। এখানে তৃতীয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এসব বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে।

(২) সারকথা, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি ও সৃষ্টজগতের উপর চিন্তা-গবেষণা করে তাঁর মাহাত্ম্য ও কুদরাত সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি মহৎ ও উচ্চ পর্যায়ের ইবাদাত। সেগুলোর মধ্যে গভীর মনোনিবেশ করে তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ না করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। উল্লেখিত আয়াতের শেষ বাক্যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহে চিন্তা গবেষণা করার ফলাফল বাতলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا﴾ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন সৃষ্টির উপর যে লোক চিন্তা-ভাবনা করে সে লোক সহজেই বুঝে যে, এসব বস্তু-সামগ্রীকে আল্লাহ্ নিরর্থক সৃষ্টি করেননি; বরং এসবের সৃষ্টির পেছনে হাজারো তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। সে সমস্তকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়ে মানুষকে এ চিন্তা-ভাবনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, সমগ্র পৃথিবী তাদের কল্যাণের জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতের উদ্দেশ্যে। এটাই হল তাদের জীবনের লক্ষ্য। সুতরাং গোটা বিশ্ব-সৃষ্টি নিরর্থক নয় বরং এগুলো সবই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের অসীম কুদরাত ও হেকমতেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উবাইদ ইবনে উমাইর বলেনঃ আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বললাম, রাসূলের সবচেয়ে আশ্চর্য কি কাজ আপনি দেখেছেন, তা আমাদেরকে জানান। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, 'হে আয়েশা, আমাকে আমার রবের ইবাদাত করতে দাও।' আমি বললাম, 'হে রাসূল, আমি আপনার পাশে থাকতে ভালবাসি এবং যা আপনাকে খুশি করে তা করতে ভালবাসি।' তারপর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করলেন এবং সালাত আদায়ে নিবিষ্ট হলেন ও কাঁদতে থাকলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি কাঁদছেন অথচ আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? এ রাতে

আপনি অত্যন্ত পবিত্র, অতএব আপনি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।'

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدۡخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدۡ أَخۡزَيۡتَهُۥۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ١٩٢

১৯২. 'হে আমাদের রব! আপনি কাউকেও আগুনে নিক্ষেপ করলে তাকে তো আপনি নিশ্চয়ই হেয় করলেন এবং যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।'

رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَـَٔامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ ١٩٣

১৯৩. 'হে আমাদের রব, আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের রবের উপর ঈমান আন।' কাজেই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করুন, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত করুন এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিন[১]।

رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخۡزِنَا يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ إِنَّكَ لَا تُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ ١٩٤

১৯৪. 'হে আমাদের রব! আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাদেরকে দান করুন

আমার উপর একটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যে ব্যক্তি তা তেলাওয়াত করল এবং চিন্তা-গবেষণা করল না, তার ধ্বংস অনিবার্য। তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। [সহীহ্ ইবনে হিব্বানঃ ৬২০]

(১) কাতাদা বলেন, তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে আহ্বান শুনতে পেয়েছে তাতে তারা সুন্দরভাবে সাড়া দিয়েছে এবং এর উপর ধৈর্য ধারণ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে ঈমানদার মানুষরা যখন আল্লাহ্‌র আহ্বান শুনে তাতে সাড়া দিয়েছে তখন তাদের কথা কি ছিল তা বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে ঈমানদার জিনরা আল্লাহ্‌র আহ্বান শুনে সে আহ্বানে যে কথা দিয়ে সাড়া দিয়েছে তা সূরা আল-জিন এ বর্ণনা করেছেন। সেখানে এসেছে, "আমরা এক আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি যে সঠিক পথের দিশা দেয়, ফলে আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না।" [সূরা জিন: ১-২] সাড়ার ব্যাপারে তাদের কোন পার্থক্য না থাকলেও কথার মধ্যে পার্থক্য ছিল। [তাবারী]

এবং কেয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করবেন না। নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।'

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

১৯৫. তারপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে আমলকারী কোন নর বা নারীর আমল বিফল করি না[১]; তোমরা একে অপরের অংশ। কাজেই যারা হিজরত করেছে, নিজ ঘর থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি তাদের পাপ কাজগুলো অবশ্যই দূর করব[২] এবং অবশ্যই তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পুরস্কার; আর উত্তম পুরস্কার আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে।

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

১৯৬. যারা কুফরী করেছে, দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই আপনাকে বিভ্রান্ত না করে।

(১) উম্মে সালামাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদের হিজরত সম্পর্কে কোন কিছু বলেন না কেন? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩০০]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হকের বেলায় যে সমস্ত ত্রুটি গাফলতী ও পাপ হয়ে থাকবে তা হিজরত ও শাহাদাতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। তার কারণ, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ঋণ বা ধারকে এ থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। বান্দার হক থেকে ক্ষমা পাওয়ার নিয়ম হল স্বয়ং পাওনাদার কিংবা তার উত্তরাধিকারীকে প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেবে। অবশ্য যদি কারো প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে পাওনাদারকে রাযী করিয়ে দেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা।

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

১৯৭. এ তো স্বল্পকালীন ভোগ মাত্র; তারপর জাহান্নাম তাদের আবাস; আর ওটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

১৯৮. কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আতিথেয়তা; আর আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য উত্তম।

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. আর নিশ্চয় কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তাঁর প্রতি এবং তিনি যা তোমাদের ও তাদের প্রতি নাযিল করেছেন তাতে ঈমান আনে। তারা আল্লাহ্‌র আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে না। তারাই, যাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী(১)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾

২০০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর(২), ধৈর্যে প্রতিযোগিতা

(১) আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নাজ্জাসীর মৃত্যুর খবর ঘোষিত হল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তার উপর সালাত আদায় কর। তারা বললঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা কি এ লোকটির উপর সালাত আদায় করব? তখন আল্লাহ্ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করলেন। [আল-আহাদীসুল মুখতারাহ্ঃ ২০৩৮]

(২) এ আয়াতটিতে মুসলিমগণকে চারটি বিষয়ে নসীহত করা হয়েছে- (১) সবর, (২) মুসাবারাহ্ (৩) মুরাবাতা ও (৪) তাকওয়া, -যা এ তিনের সাথে অপরিহার্যভাবে যুক্ত। তন্মধ্যে ‘সবর’ এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা ও বাধা দেয়া। আর কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় এর অর্থ নফ্‌সকে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর জমিয়ে রাখা। এর তিনটি প্রকার রয়েছে- (এক) ‘সবর আলাত্বা‘আত’। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা

কর[১] এবং সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক[২], আর আল্লাহ্‌র

ও তাঁর রাসূল যে সমস্ত কাজের হুকুম করেছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা মনের উপর যত কঠিনই হোক না কেন তাতে মনকে স্থির রাখা। (দুই) 'সবর 'আনিল মা'আসী' অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন, সেগুলো মনের জন্য যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, যত স্বাদেরই হোক না কেন, তা থেকে মনকে বিরত রাখা। (তিন) 'সবর 'আলাল-মাসায়েব' অর্থাৎ বিপদাপদ ও কষ্টের বেলায় সবর করা, ধৈর্য ধারণ করা, অধৈর্য না হওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে আগত মনে করে মন-মস্তিস্ককে সেজন্য অধৈর্য করে না তোলা। [ইবনুল কাইয়্যেম, আল-জাওয়াবুল কাফী লিমান সাআলা আনিদ দাওয়ায়িশ শাফী; মাদারিজুস সালেকীন]

(১) 'মুসাবারাহ' শব্দটি সবর থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ, শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা। অথবা পরস্পর ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করা।

(২) 'মুরাবাতাহ' অর্থ হলো, ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়-

১) ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের হেফাযতে সুসজ্জিত হয়ে থাকা অপরিহার্য, যাতে ইসলামী সীমান্তের প্রতি শত্রুরা রক্তচক্ষু তুলে তাকাতেও সাহস না পায়। এটিই 'রিবাত' ও 'মুরাবাতাহ' এর বিখ্যাত অর্থ। এর দু'টি রূপ হতে পারেঃ প্রথমতঃ যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই, সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত, এমতাবস্থায় শুধুমাত্র অগ্রিম হেফাযত হিসাবে তার দেখা-শোনা করতে থাকা। এক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনসহ সেখানে (সীমান্তে) বসবাস করতে থাকা কিংবা চাষাবাদ করে রুযী-রোজগার করাও জায়েয। এমতাবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষাই নিয়ত হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় রুযী-রোজগার করা যদি তারই আনুষঙ্গিক বিষয় হয়, তবে এমন ব্যক্তিরও 'রিবাত ফী সাবীলিল্লাহ্'র সওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনও যুদ্ধ করতে না হয়, তবুও। কিন্তু প্রকৃত নিয়ত যদি সীমান্তের হেফাযত না হয়, বরং রুযী-রোজগারই হয় মুখ্য, তবে দৃশ্যতঃ সীমান্ত রক্ষার কাজ করে থাকলেও এমন ব্যক্তি 'মুরাবিত ফী-সাবিলিল্লাহ্' হবে না। অর্থাৎ সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সীমান্ত রক্ষাকারী বলে গণ্য হবে না। দ্বিতীয়তঃ সীমান্তে যদি শত্রুর আক্রমণের আশংকা থাকে, তবে এমতাবস্থায় নারী ও শিশুদিগকে সেখানে রাখা জায়েয নয়। তখন সেখানে তারাই থাকবে, যারা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। এতদুভয় অবস্থায় 'রিবাত' বা সীমান্তরক্ষার অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। এক হাদীসে সাহ্‌ল ইবনে সা'দ আস্-সায়েদী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 'আল্লাহ্‌র পথে এক দিনের 'রিবাত' (সীমান্ত প্রহরা) সমগ্র দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে সে সমুদয় থেকেও উত্তম। [বুখারীঃ ২৭৯৪, মুসলিমঃ ১৮৮১] অপর এক হাদীসে রয়েছে যে,

তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'একদিন ও একরাতের 'রেবাত' (সীমান্ত প্রহরা) ক্রমাগত এক মাসের সিয়াম এবং সমগ্র রাত ইবাদাতে কাটিয়ে দেয়া অপেক্ষা উত্তম । যদি এমতাবস্থায় কারো মৃত্যু হয়, তাহলে তার সীমান্ত প্রহরার পর্যায়ক্রমিক সওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে । আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার রিয্ক জারী থাকবে এবং সে কবরের ফেতনা বা পরীক্ষা (প্রশ্নোত্তর) থেকে নিরাপত্তা পাবে । [মুসলিমঃ ১৯১৩]

ফুদালাহ্ ইবনে উবায়েদ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় শুধুমাত্র মুরাবিত (ইসলামী সীমান্তরক্ষী) ছাড়া । অর্থাৎ তার কাজ কেয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং সে কবরের হিসাব-নিকাশ থেকে নিরাপদ থাকবে । [আবু দাউদঃ ২৫০০]

এসব বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'রিবাত' বা সীমান্ত রক্ষার কাজটি সদকায়ে জারিয়া অপেক্ষাও উত্তম । কারণ, সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সদকাকৃত বাড়ী-ঘর, জমি-জমা, রচিত গ্রন্থরাজি কিংবা ওয়াক্ফকৃত জিনিসের দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে । যখন উপকারিতা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার সওয়াবও বন্ধ হয়ে যায় । কিন্তু আল্লাহ্র পথে সীমান্ত প্রহরার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না । কারণ, সমস্ত মুসলিম সৎকর্মে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকবে । ফলে একজন সীমান্তরক্ষীর এ কাজ সমস্ত মুসলিমদের সৎকাজের কারণ হয় । সে কারণেই কেয়ামত পর্যন্ত তার 'রিবাত' কর্মের সওয়াব অব্যাহত থাকবে । তাছাড়াও সে যত নেক কাজ দুনিয়ায় করত, সেগুলোর সওয়াবও আমল করা ছাড়াই সর্বদা জারী থাকবে ।

২) কুরআন ও হাদীসে 'রিবাত' দ্বিতীয় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা হচ্ছে, জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ে খুবই যত্নবান হওয়া এবং এক সালাতের পরই দ্বিতীয় সালাতের জন্য অপেক্ষামান থাকা । এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের সংবাদ দিব না, যা করলে তোমাদের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং তোমাদের মর্যাদা বুলন্দ হবে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, অবশ্যই । তিনি বললেন, তা হচ্ছে, কষ্টকর স্থান বা সময়ে অযুর পানি সঠিকভাবে পৌঁছানো, মসজিদের প্রতি বেশী বেশী পদক্ষেপ এবং এক সালাতের পরে অপর সালাতের অপেক্ষায় থাকা । আর এটিই হচ্ছে, রিবাত ।" [মুসলিমঃ ২৫১]

বাস্তবে উভয় অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । প্রথম অর্থটি মানব শয়তানদের বিরুদ্ধে জিহাদের অংশ । আর দ্বিতীয় অর্থটি জিন শয়তানদের বিরুদ্ধে এক অমোঘ অস্ত্র । সুতরাং আয়াতে উভয় অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে ।